তফসীরে

মা'আরেফুল-কোরআন

অষ্টম খণ্ড

[সূরা মুহাম্মদ থেকে সূরা নাস]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা মুহাম্মদ	১
যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসন-কর্তার চারটি ক্ষমতা	৬
ইসলামে দাসত্ব	৬
জিহাদ সিদ্ধ হওয়ার রহস্য	১২
ইস্তিগফার সম্পর্কে জ্ঞাতব্য	১৯
আত্মীয়তা বজায় রাখার তাকীদ	২৬
ইয়াযীদের প্রতি অভিসম্পাত বৈধ কিনা ?	২৬
সূরা ফাতহ	৩৭
হুদায়বিয়ার ঘটনা	৩৯
হুদায়বিয়ার সন্ধি	৪৫
ইহরাম খোলা ও কুরবানী	৪৮
সন্ধির ফলাফল	৪৯
ওহী শুধু কোরআনে সীমাবদ্ধ নয়	৬১
সাহাবায়ে কিরামের প্রতি দোষারোপ	৬৬
রিযওয়ান বৃক্ষ	৬৬
সাহাবায়ে কিরাম প্রসঙ্গ	৭২
ইনুশাআল্লাহ বলার তাকীদ	৭৬
সাহাবায়ে কিরামের গুণাবলী	৭৮
সাহাবায়ে কিরাম সবাই জান্নাতী	৮৩
সূরা হুজুরাত	৮৫
যোগসূত্র ও শানে-নুযুল	৮৬
আলিমদের আদব	৮৮
রওযা মোবারকের যিয়ারত	৮৯
সাহাবীগণের সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও জওয়াব	৯৪
সাহাবীগণের পারস্পরিক বাদানুবাদ	১০০
নাম ও লকব প্রসঙ্গ	১০৪
গীবত প্রসঙ্গ	১০৭
বংশ ও ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য	১১৩
ইসলাম ও ঈমান	১১৭
সূরা ক্বাফ	১১৮
আকাশ প্রসঙ্গ	১২১
মৃত্যুর পর পুনরুত্থান	১২২
আল্লাহ ধমনীর চাইতেও নিকটবর্তী	১২৮
প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে	১৩০
আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা	১৩০
প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয়	১৩১
মৃত্যু যন্ত্রণা	১৩২
মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতকারী ফেরেশতা	১৩৩
মৃত্যুর পর দৃষ্টি খুলে যাবে	১৩৩
সূরা যারিয়াত	১৪৪
ইবাদতে রাত্রি জাগরণ	১৪৯
রাত্রির শেষ প্রহরের বরকত ও ফযীলত	১৫০
সদকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ	১৫১
মেহমানদারির উত্তম রীতি-নীতি	১৫৮
জিন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য	১৬৩
সূরা তূর	১৬৬
মজলিসের কাফফারা	১৭৯
সূরা নজম	১৮১
সূরা নজমের বৈশিষ্ট্য	১৮৫
মি'রাজ প্রসঙ্গ	১৮৭
জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান	১৯৩
আল্লাহর দীদার	১৯৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইবরাহীম (আ)-এর বিশেষ গুণ	২১১
মূসা ও ইব্রাহীম (আ)-এর সহীফা	২১২
একের গোনাহে অপরকে পাকড়াও করা হবে না	২১২
ইসালে সওয়াব প্রসঙ্গ	২১৩
সূরা ক্বামর	২১৮
চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা	২২০
চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন	২২১
ইজতিহাদ ও কোরআন	২২৫
সূরা আর-রহমান	২৩৪
একটি বাক্য বারবার উল্লেখ করার তাৎপর্য	২৩৫
সূরা ওয়াক্বিয়া	২৬০
সূরার বৈশিষ্ট্য ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কথোপকথন	২৬৫
হাশরের ময়দানে মানুষের শ্রেণীবিভক্তি	২৬৬
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা ?	২৬৭
কোরআন স্পর্শ করার মাসআলা	২৮৪
সূরা হাদীদ	২৮৭
শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিকার	২৮৯
মক্কা বিজয় ও সাহাবায়ে কিরাম	২৯৫
সাহাবীগণের বৈশিষ্ট্য	২৯৬
হাশরের ময়দানে নূর ও অন্ধকার	৩০৬
খেলাধূলা প্রসঙ্গ	৩১২
সন্ন্যাসবাদ প্রসঙ্গ	৩২৫
সূরা মুজাদালা	৩৩০
জিহারের সংজ্ঞা ও বিধান	৩৩৪
গোপন পরামর্শ সম্পর্কে নির্দেশ	৩৪৩
মজলিসের শিষ্টাচার	৩৪৫
কাফির ও গোনাহগারদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা	৩৫১
সূরা হাশর	৩৫৩
সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনু নুযায়ের গোত্রের ইতিহাস	৩৫৬
ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা	৩৫৮
হাদীস অস্বীকারকারীদের প্রতি হুশিয়ারী	৩৬০
ইজতেহাদী মতভেদ প্রসঙ্গ	৩৬০
যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রসঙ্গ	৩৬৪
সম্পদ পুঞ্জীভূত করা প্রসঙ্গ	৩৬৭
রসূলের নির্দেশ প্রসঙ্গ	৩৬৯
দানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার	৩৭০
মুহাজির প্রসঙ্গ	৩৭০
আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব	৩৭২
বনু নুযায়রের ধন -সম্পদ বন্টন প্রসঙ্গ	৩৭৩
আনসারগণের আত্মত্যাগ	৩৭৪
মুহাজিরগণের বিনিময়	৩৭৮
হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্রতা	৩৭৯
উম্মতের সাধারণ মুসলমান প্রসঙ্গ	৩৮০
সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মহব্বত	৩৮০
বনু কায়নুকার নির্বাসন	৩৮৫
কিয়ামত প্রসঙ্গ	৩৮৯
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত	৩৯৪
সূরা মুমতাহিনা	৩৯৫
বদর যুদ্ধ পরবর্তী মক্কার অবস্থা	৩৯৮
মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি	৩৯৯
হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তির কতিপয় শর্ত বিশ্লেষণ	৪১০
নারীদের আনুগত্যের শপথ	৪১৬
সূরা সফ	৪২০
দাবী ও দাওয়াতের পার্থক্য	৪২৫
ইঞ্জীলে রসূলে করীমের সুসংবাদ	৪২৬
খৃস্টানদের তিন দল	৪৩০
সূরা জুমু'আ'	৪৩২
পয়গম্বর প্রেরণের উদ্দেশ্য	৪৩৫
মৃত্যু কামনা জায়েয কিনা	৪৩৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
মৃত্যুর কারণাদি থেকে পলায়নের বিধান	৪৩৯
জুমু'আ প্রসঙ্গ	৪৪১
জুম'আর পরে ব্যবসায়ে বরকত	৪৪৩
সূরা মুনাফিকুন	৪৪৬
দেশ ও বংশগত জাতীয়তা	৪৪৯
মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই প্রসঙ্গ	৪৫০
ইসলামে বর্ণ, বংশ, ভাষা এবং দেশী ও বিদেশীর পার্থক্য নেই	৪৫৪
সাহাবায়ে কিরামের অপূর্ব দৃঢ়তা	৪৫৫
মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা	৪৫৬
সূরা তাগাবুন	৪৬২
কিয়ামত প্রসঙ্গ	৪৬৭
গোনাহগার স্ত্রী ও সন্তান প্রসঙ্গ	৪৭২
ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি বিরাট পরীক্ষা	৪৭৩
সূরা তালাক	৪৭৪
বিবাহ ও তালাক প্রহসঙ্গ	৪৭৯
এক সাথে তিন তালাক দেওয়া	৪৮৭
বিপদাপদ থেকে মুক্তি	৪৯১
তালাকের ইদ্দত সম্পর্কিত বিধান	৪৯২
পৃথিবীর সপ্তস্তর প্রসঙ্গ	৪৯৯
সূরা তাহরীম	৫০১
কোন হালাল বস্তুকে নিজের উপর হারাম করা প্রসঙ্গ	৫০৩
স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা	৫০৮
তওবা প্রসঙ্গ	৫১১
সূরা মুলক	৫১৪
মরণ ও জীবনের স্বরূপ	৫২৩
নেক আমল কি ?	৫২৪
সূরা কলম	৫৩০
কলম-এর অর্থ ও ফযীলত	৫৩৯
রসূলুল্লাহ (সা)-র মহৎ চরিত্র	৫৪১
উদ্যানের মালিকদের কাহিনী	৫৪৪
কিয়ামতের একটি যুক্তি	৫৪৭
সূরা হাক্কা	৫৫১
সূরা মা'আরিজ	৫৬২
কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য	৫৬৮
যাকাতের পরিমাণ	৫৭১
হস্তমৈথুন করা হারাম	৫৭১
সর্ব প্রকার 'হক'-ই আমানত	৫৭২
সূরা নূহ	৫৭৩
মানুষের বয়স হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা	৫৭৮
কবরের আযাব	৫৮২
সূরা জিন	৫৮৩
জিনদের স্বরূপ	৫৯০
রসূলুল্লাহর তায়েফ সফর	৫৯০
জিন-সাহাবীর ঘটনা	৫৯২
জিনদের আকাশ ভ্রমণ	৫৯৫
গায়েব ও গায়েবের খবর প্রসঙ্গ	৫৯৭
সূরা মুযযাম্মিল	৫৯৯
তাহাজ্জুদ প্রসঙ্গ	৬০৪
ইসমে যাতের যিকির	৬১০
তাওয়াক্কুলের অর্থ	৬১২
তাহাজ্জুদ ফরয নয়	৬১৩
সূরা মুদ্দাসসির	৬১৮
রসূলুল্লাহর প্রতি কতিপয় বিশেষ নির্দেশ	৬২৭
আবূ জাহল ও ওলীদের কথোপকথন	৬৩০
সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা একটি নিয়ামত	৬৩২
কাফিরের জন্য সুপারিশ	৬৩৪
সূরা কিয়ামত	৬৩৬
নফসের তিনটি প্রকার	৬৪১
পুনরুত্থান প্রসঙ্গ	৬৪২

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইমামের পিছনে কিরাআত প্রসঙ্গ	৬৪৫
সূরা দাহর	৬৪৮
মানব সৃষ্টিতে আল্লাহর অপূর্ব রহস্য	৬৫৫
সূরা মুরসালাত	৬৬০
সূরা নাবা	৬৭০
জাহান্নামে চিরকাল বসবাস প্রসঙ্গ	৬৭৮
সূরা নাযিয়াত	৬৮২
কবরে সওয়াব ও আযাব	৬৮৭
খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা	৬৯০
নফসের চক্রান্ত	৬৯৩
সূরা আবাসা	৬৯৩
সূরা তাকভীর	৭০৩
সূরা ইনফিতার	৭১১
সূরা তাৎফীফ	৭১৫
ওজনে কম দেওয়া	৭১৯
সিজ্জীন ও ইল্লীন	৭২১
জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থানস্থল	৭২১
সূরা ইনশিকাক	৭২৭
আল্লাহ্‌র নির্দেশ দুই প্রকার	৭৩০
আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন	৭৩১
মানুষের অস্তিত্ব ও তার শেষ মঞ্জিল	৭৩৪
সূরা বুরূজ	৭৩৮
সূরা তারেক	৭৪৫
সূরা আ'লা	৭৫০
বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় তাৎপর্য	৭৫৩
বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও আল্লাহর দান	৭৫৫
ইব্রাহিমী সহীফার বিষয়বস্তু	৭৫৮
সূরা গাশিয়া	৭৬০
জাহান্নামে ঘাস, বৃক্ষ কিরূপে হবে	৭৬৩
সূরা ফজর	৭৬৬
পাঁচটি বিষয়	৭৭০
রিযিকের স্বল্পতা ও বাহুল্য	৭৭৪
ইয়াতীমের জন্য ব্যয়	৭৭৫
কয়েকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা	৭৭৯
সূরা বালাদ	৭৮০
চক্ষু ও জিহবা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য	৭৮৪
অপরকে ও সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া	৭৮৬
সূরা শামস	৭৮৭
কয়েকটি শপথের তাৎপর্য	৭৮৯
সূরা লায়ল	৭৯৩
কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল	৭৯৫
সাহাবায়ে কিরাম সবাই জাহান্নাম থেকে মুক্ত	৭৯৭
সূরা যোহা	৮০০
কয়েকটি নিয়ামত ও এ সম্পর্কিত নির্দেশ	৮৮৩
সূরা ইনশিরাহ	৮০৬
শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কর্তব্য	৮১০
সূরা তীন	৮১১
সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর	৮১৩
সূরা আলাক	৮১৬
ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী	৮২০
কলম তিন প্রকার	৮২৪
লিখন জ্ঞান সর্বপ্রথম কাকে দান করা হয়	৮২৫
রসূলুল্লাহকে লিখন শিক্ষা না দেওয়ার রহস্য	৮২৫
সিজদায় দোয়া কবূল হয়	৮২৯
সূরা কদর	৮৩০
লায়লাতুল কদরের অর্থ	৮৩১
শবে-কদর কোন রাত্রি ?	৮৩২
শবে-কদরের ফযীলত ও বিশেষ দোয়া	৮৩২
সমস্ত ঐশী কিতাব রমযানেই অবতীর্ণ হয়েছে	৮৩৩
সূরা বাইয়্যিনাহ	৮৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা যিলযাল	৮৪১
সূরা আদিয়াত	৮৪৪
সূরা কারেয়া	৮৪৮
সূরা তাকাসুর	৮৫০
সূরা আছর	৮৫৪
মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততার যুগ ও কালের প্রভাব	৮৫৫
নাজাতের শর্ত	৮৫৭
সূরা হুমাযা	৮৫৮
সূরা ফীল	৮৬১
হস্তীবাহিনীর ঘটনা	৮৬১
সূরা কোরায়েশ	৮৬৭
কোরায়েশদের শ্রেষ্ঠত্ব	৮৬৮
সূরা মাউন	৮৭১
সূরা কাউসার	৮৭৪
হাউযে কাউসার	৮৭৬
সূরা কাফিরূন	৮৭৯
কাফিরদের সাথে শান্তিচুক্তি প্রসঙ্গ	৮৮২
সূরা নছর	৮৮৪
কোরআনের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত	৮৮৫
মৃত্যু নিকটবর্তী হলে	৮৮৬
সূরা লাহাব	৮৮৭
পরোক্ষে নিন্দাবাদ	৮৯০
সূরা ইখলাস	৮৯২
সূরার ফযীলত	৮৯৩
শিরকের পূর্ণ বিরোধিতা	৮৯৪
সূরা ফালাক	৮৯৫
যাদুগ্রস্ত হওয়া বনাম নবুয়ত	৮৯৭
সূরা নাস ও সূরা ফালাকের ফযীলত	৮৯৭
সূরা নাস	৯০১
শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার গুরুত্ব	৯০৪
সূরা নাস ও সূরা ফালাক এর মধ্যে পার্থক্য	৯০৫
মানুষের শত্রু মানুষও শয়তান ও	৯০৫
উভয় শত্রুর মোকাবিলায় ব্যবধান	৯০৫
শয়তানী চক্রান্ত ক্ষণভঙ্গুর	৯০৭
কোরআনের সূচনা ও সমাপ্তি	৯০৭

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্বমানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন-সম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত, বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যবিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী বিধায় সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। বস্তুত, এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাস্সিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমীন !

এ জেড এম শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংস্করণের আরয

আল্লাহ্ পাকের খাস রহমতে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন এদেশের সুধী পাঠকগণের কাছে কতটুকু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তা এ বিরাট গ্রন্থটির সব কয়টি খণ্ডের ২/৩টি সংস্করণের মাধ্যমেই অনুমান করা যেতে পারে। বলতে কি যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলিম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-র আন্তরিক নিষ্ঠার ফলশ্রুতিই বোধ হয় তাঁর লিখিত তফসীরখানির এমন অসাধারণ জনপ্রিয়তার কারণ। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক যুগেই যুগ-চাহিদা পূরণে সক্ষম কিছু ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে থাকেন। এ যুগের বিভিন্ন সমস্যার কোরআন ও সুন্নাহ্ সম্মত সহীহ্ সমাধান পেশ করার জন্য বোধ হয় আল্লাহ্ পাক এ উপমহাদেশের পরিমণ্ডলে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)-কে মনোনীত করেছিলেন। তাঁর লিখিত মা'আরেফুল-কোরআন এবং অন্যান্য কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

এ তফসীরের প্রতিটি সংস্করণই সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। উক্ত খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণেও ব্যাপক সংশোধন করা হয়েছে। পাঠকগণের খেদমতে আরয, দোয়া করুন সবগুলো খণ্ডেরই সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করার তওফীক আল্লাহ্ পাক যেন দান করেন।

বিনীত

মুহিউদ্দীন খান

سورة محمد

সূরা মুহাম্মাদ

মদীনায় অবতীর্ণ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝١ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ
كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝٢ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا
اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ
يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝٣

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে।

(১) যারা কুফর করে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। (২) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। (৩) এটা এ কারণে যে, যারা কাফির, তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (নিজেরাও) কুফর করে এবং (অপরকেও) আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে, (যেমন কাফির সরদারদের অবস্থা ছিল, তারা ইসলামের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য জান ও মাল সবকিছু দ্বারা প্রচেষ্টা চালাত), আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। (অর্থাৎ যেসব কর্মকে তারা ফলপ্রসূ মনে করে, ঈমান না থাকার কারণে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়, বরং উহার মধ্যে কিছু কিছু কর্ম উল্টা তাদের শাস্তির কারণ হবে; যেমন, আল্লাহ্‌র পথে

বাধা সৃষ্টি করার কাজে অর্থকড়ি ব্যয় করা। আল্লাহ্ বলেন ঃ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً الخ পক্ষান্তরে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং (তাদের বিশ্বাসের বিবরণ এই যে) তারা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা) -এর প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, (যা মেনে চলাও জরুরী)। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোনাহ্সমূহ মার্জনা করবেন এবং (উভয় জাহানে) তাদের অবস্থা ভাল রাখবেন (ইহকালে এভাবে যে, তাদের সৎকর্ম করার তওফীক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং পরকালে এভাবে যে, তারা আযাব থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে)। এটা (অর্থাৎ মু'মিনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কাফিরদের দুর্গতি) এ কারণে যে, কাফিররা ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করে এবং ঈমানদাররা শুদ্ধ পথের অনুসরণ করে ; যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। (ভ্রান্ত পথের পরিণাম যে ব্যর্থতা এবং শুদ্ধ পথের পরিণাম যে সাফল্য, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই কাফিররা ব্যর্থ মনোরথ হবে এবং মু'মিনগণ সফলকাম হবেন। ইসলাম যে শুদ্ধপথ, এ সম্পর্কে সন্দেহ হলে مِنْ رَبِّهِمْ বলে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রমাণ এই যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত। পয়গম্বরের মো'জেযাসমূহ বিশেষ করে কোরআনের অলৌকিকতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত)। আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে (অর্থাৎ উপরোক্ত অবস্থা বর্ণনা করার মতই) মানুষের (উপকার ও হিদায়তের) জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন, (যাতে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন—উভয় পন্থায় তাদেরকে হিদায়ত করা যায়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুহাম্মদের অপর নাম সূরা কিতালও। কেননা, এতে 'কিতাল' তথা জিহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি, এর একটি আয়াত كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত। কেননা, এই আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মক্কার জনবসতি ও বায়তুল্লাহ্র দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন ঃ হে মক্কা নগরী, জগতের সমস্ত নগরের মধ্যে তুমিই আমার কাছে প্রিয়। যদি মক্কার অধিবাসীরা আমাকে এখান থেকে বহিষ্কার না করত, তবে আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। তফসীরবিদগণের পরিভাষায় যে আয়াত হিজরতের সফরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত গণ্য করা হয়। মোটকথা এই যে, এই সূরা মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং মদীনায় পৌঁছেই কাফিরদের সাথে জিহাদ ও যুদ্ধের বিধানাবলী নাযিল হয়েছে।

صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ—এখানে سَبِيلِ اللهِ (আল্লাহ্‌র পথ) বলে ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ বলে কাফিরদের ঐ সকল কর্ম বোঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে সৎ কর্ম, যেমন ফকীর-মিসকীনকে সাহায্য ও সহায়তা করা, প্রতিবেশীর সমর্থন ও হিফাযত করা, দানশীলতা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব কর্ম যদিও প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম, কিন্তু ঈমানসহ হলেই পরকালে এগুলো দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। কাফিরদের এ ধরনের সৎ কর্ম পরকালে তাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। তবে তাদের সৎ কর্মের বিনিময়ে ইহকালেই তাদেরকে আরাম ও সুখ দান করা হয়।

وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ—যদিও পূর্ববর্তী বাক্যেও ঈমান ও সৎ কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে একথা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য ব্যক্ত করা যে, শেষনবী মুহাম্মদ (সা)-এর সমস্ত শিক্ষা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার উপরই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ—بال শব্দটি কখনও অবস্থার অর্থে এবং কখনও অন্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থ নেওয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অবস্থাকে অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ভাল করে দেন। দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। এর সারমর্মও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া। কেননা, কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া অন্তর ঠিক করে দেওয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۗ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ

(৪) অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সংবরণ করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'মিনরা সংস্কারকামী এবং কাফিররা অনর্থকামী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুফর ও কাফিরদের অনর্থ দূর করার জন্য আলোচ্য আয়াতে জিহাদের বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে)। অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদের খুব রক্তপাত ঘটিয়ে নাও, (এর অর্থ কাফিরদের শৌর্যবীর্য নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধ বন্ধ করা হলে মুসলমানদের ক্ষতি অথবা কাফিরদের প্রবল হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকা) তখন (কাফিরদেরকে বন্দী করে) খুব শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর (তোমরা উভয় কাজ করতে পার) হয় তাদেরকে মুক্তিপণ না নিয়ে মুক্ত করে দেবে, না হয় মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেবে। (এই যুদ্ধ ও বন্দী করার নির্দেশ তখন পর্যন্ত) যে পর্যন্ত না (শত্রু) যোদ্ধারা অস্ত্র সংবরণ করে। (অর্থাৎ হয় তারা ইসলাম কবূল করবে, না হয় মুসলমানদের যিম্মী হয়ে বসবাস করতে রাযী হবে। এরূপ করলে যুদ্ধ ও বন্দী কোন কিছুই করা জায়েয হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক. যুদ্ধের মাধ্যমে কাফিরদের শৌর্যবীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। দুই. অতঃপর এই যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদেরকে দু'রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত কৃপাবশে তাদেরকে কোন রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। মুক্তিপণ এরূপও হতে পারে যে, আমাদের কিছু-সংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দী থাকলে তাদের বিনিময়ে কাফির বন্দীদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পারে যে, কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। এই বিধান পূর্ব-বর্ণিত সূরা আনফালের বিধানের বাহ্যত খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তিবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেনঃ আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল---যদি এই আযাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা, তারা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সার কথা এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ করেছিল। কাজেই মুক্তি-পণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া আরও উত্তমরূপে নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্‌হবিদ বলেন যে, সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হাসান, আতা (র), অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্‌হবিদের উক্তি তাই। সওরী, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (র) প্রমুখ ফিক্‌হবিদ ইমামের মাযহাবও তাই। হযরত ইবনে

আব্বাস (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সূরা মুহাম্মদে কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়ার অনুমতি দান করা হয়। তফসীরে মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ্ এ কথাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ উক্তিই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। কেননা, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এই আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ্ (সা) ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে মুক্ত করেছিলেন।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার আশি জন কাফির রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অতর্কিতে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তানয়ীম পাহাড় থেকে নিচে অবতরণ করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ○

এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র প্রসিদ্ধ মাযহাব এই যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া জায়েয নয়। এ কারণেই হানাফী আলিমগণ সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আযমের মতে রহিত ও সূরা আনফালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরে মাযহারী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সূরা মুহাম্মদের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাম্মদের আয়াতই রহিতকারী এবং সূরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আযমের পছন্দনীয় মাযহাবও অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্‌হবিদের অনুরূপ মুক্ত করা জায়েয বলে তফসীরে মাযহারী বর্ণনা করেছে। যদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে, তফসীরে মাযহারীর মতে এটাই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় মাযহাব। হানাফী আলিমগণের মধ্যে আল্লামা ইবনে হুমাম (র) 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে এই মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেনঃ কুদুরী ও হিদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করা যায় না। এটা ইমাম আযম থেকে বর্ণিত এক রিওয়ায়েত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই অপর এক রিওয়ায়েত 'সিয়ারে কবীরে' জমহুরের উক্তির অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, মুক্ত করা জায়েয। উভয় রিওয়ায়েতের মধ্যে শেষোক্ত রিওয়ায়েতই অধিক স্পষ্ট। ইমাম তাহাভী (র) 'মা-'আনিউল আসারে' একেই ইমাম আযমের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা এই যে, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা আনফালের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্‌হবিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী রসূলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্ম-পন্থা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনও হত্যা করা হয়েছে, কখনও গোলাম করা হয়েছে, কখনও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কখনও মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপণ নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যে সব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তদ্রূপ নয়; বরং সবগুলো অকাট্য আয়াত। কোন আয়াতই রহিত নয়। কেননা, কাফিররা যখন বন্দী হয়ে আমাদের হাতে আসবে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দীদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে গোলাম ও বাঁদী করে নেবেন, মুক্তিপণ নেওয়া উপযুক্ত মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন অথবা কোন-রূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর কুরতুবী লিখেন ঃ

وهذا القول يروى من اهل المدينة والشافعى وابى عبيد وحكاه الطحاوى مذهبا عن ابى حنيفة والمشهور ما قدمنا ه -

অর্থাৎ মদীনার আলিমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী ও আবূ ওবায়েদ (র)-এর উক্তি। ইমাম তাহাভী, ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মাযহাব এর বিপক্ষে।

যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা ঃ উপরোক্ত বক্তব্য থেকে ফুটে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকে গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রশ্নে উম্মতের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

ইসলামে দাসত্বের আলোচনা ঃ এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে তো ফিক্‌হবিদগণের মধ্যে কিছু না কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েয। এমতাবস্থায় কোরআন পাকে এই ব্যবস্থাদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়নি কেন? শুধু মুক্ত করে দেওয়ার দুই ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হল? ইমাম রাযী (র) তফসীরে কবীরে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুইটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা সর্বত্র ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত

করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আরবের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি নেই এবং পঙ্গু ইত্যাদি লোকের হত্যাও জায়েয নয়। এতদ্ব্যতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে।---(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৮)

দ্বিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল। সবাই জানত যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি বদর যুদ্ধের সময় রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। এখন এস্থলে মুক্ত ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। যেসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এস্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আয়াতদৃষ্টে একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কোরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হত। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হত তবে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পর কোরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম ভক্ত সাহাবায়ে কিরাম অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরম্পরা সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ সংরক্ষক হয়ে দাসত্বের অনুমতি কিরূপে দিল? প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেওয়ার কারণেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টির স্বরূপ ও প্রাণ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, অনেক অবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও গোস্তাও লিবান তদীয় 'আরবের তমদ্দুন' গ্রন্থে লিখেন ঃ

"বিগত ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আমেরিকান ঐতিহ্য পাঠে অভ্যস্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি 'দাস' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসপটে এমন মিসকীনদের চিত্র ভেসে উঠে, যাদেরকে শিকল দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ী পরানো হয়েছে এবং বেত মেরে মেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের খোরাক প্রাণটা কোনরূপ দেহে আটকে রাখার জন্যও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিত্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিত্রের অনুরূপ কি না।' --- কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে চিত্র তা খৃস্টানদের চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (ফরীদ ওয়াজদী প্রণীত দায়েরা মা'আরেফুল কোরআন থেকে উদ্ধৃত। (৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯)

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার চাইতে উত্তম কোন পথ থাকে না। কেননা দাসে পরিণত না করা হলে যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থাই সম্ভবপর—হয় হত্যা করা হবে, না হয় মুক্ত ছেড়ে দেওয়া হবে, না হয় যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবস্থা উপযোগিতার পরিপন্থী হয়। কোন কোন বন্দী উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে দিলে মাঝে মাঝে এমন আশংকা থাকে যে, স্বদেশে পৌঁছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে যাবে। এখন দুই অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে—হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দী রেখে আজকালকার মত কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবাধিকারের পুরোপুরি দেখা-শোনা করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোন্‌টি? বিশেষত দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরও সহজ। দাসদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে রসূলে করীম (সা) নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

اخوا نكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه ما يا كل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فان كلفه يغلبه فليعنه-

তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব যার ভাই তার অধীনস্থ হয় সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায়, যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয়, যা তার জন্য অসহনীয়। যদি এমন কাজের ভার দেয়, তবে যেন সে তাকে সাহায্য করে।---(বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সেমতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি ; বরং প্রভুদেরকে اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ আয়াতের মাধ্যমে জোর তাকীদও করেছে। এমনকি তারা স্বাধীন ও মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের অংশ স্বাধীন মুজাহিদের সমান। শত্রুকে প্রাণের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তিও তেমনি ধর্তব্য, যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের উক্তি। কোরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশাবলী এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলী (রা) বলেন, দু'জাহানের নেতা হযরত রসূলে মকবুল (সা)-এর পবিত্র মুখে যে বাক্যাবলী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল এই ঃ الصلوٰة الصلوٰة اتقوا الله فيما ملكت ايما نكم—অর্থাৎ নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ, নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমাদের অধীনস্থ দাসদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।---(আবূ দাউদ)

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীক্ষা অর্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই জ্ঞান-গরিমায় যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা সবাই দাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। এরপর এই নামেমাত্র দাসত্বকেও পর্যায়-ক্রমে বিলীন করা অথবা হ্রাস করার জন্য দাসদেরকে মুক্ত করার ফযীলত কোরআন ও হাদীসে ভূরি ভূরি বর্ণিত হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন অন্য কোন সৎকর্ম এর সমকক্ষ হতে পারে না। ফিক্‌হর বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত করার জন্য বাহানা তালাশ করা হয়েছে। রোযার কাফ্‌ফারা, হত্যার কাফ্‌ফারা, জিহারের কাফ্‌ফারা ও কসমের কাফ্‌ফারার মধ্যে দাস মুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে, তবে এর কাফ্‌ফারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেওয়া।---(মুসলিম) সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস ছিল তাঁরা অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন। 'আন্নাজমুল ওয়াহ্‌হাজ'-এর গ্রন্থকার কোন কোন সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

হযরত আয়েশা (রা)---৬৯, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম---১০০, হযরত ওসমান গনী (রা)---২০, হযরত আব্বাস (রা)---৭০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)---১০০০, হযরত যুল কা'লা হিমইয়ারী (রা)---৮০০০ (মাত্র এক দিনে), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)---৩০,০০০।---(ফতহুল আল্লাম, টীকা বুলুগুল মারাম, নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃঃ) এ থেকে জানা যায় যে, মাত্র সাতজন সাহাবী ৩৯,২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, অন্য আরও হাজারো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশী হবে। মোট কথা ইসলাম দাসত্বের ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী সংস্কার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসত্বকে অন্যান্য জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এসব সংস্কার সাধনের পর যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে। এরূপ করা মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব নয়। বরং কোরআন ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার এই অনুমতিও ততক্ষণ, যতক্ষণ শত্রুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোন চুক্তি না থাকে। যদি শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করব না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্য চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোন বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ নয়।

ذٰلِكَ ۚ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ
بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٤
سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝٥ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝٦
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝٧
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٨ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا
مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝٩ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ
اَمْثَالُهَا ۝١٠ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ
لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝١١

(৪-ক) একথা শুনলে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে শোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়, আল্লাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৬) অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (৭) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (৮) আর যারা কাফির, তাদের জন্য আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন। (৯) এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফিরদের অবস্থা এরূপই হবে। (১১) এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের হিতৈষী বন্ধু এবং কাফিরদের কোন হিতৈষী বন্ধু নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(জিহাদের) এই নির্দেশ (যা বর্ণিত হয়েছে) পালন কর। (কোন কোন অবস্থায় কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আল্লাহ্ জিহাদ প্রবর্তন করেছেন। এটা

বিশেষ তাৎপর্যের কারণে। নতুবা) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে (নিজেই নৈসর্গিক ও মর্ত্যের আযাব দ্বারা) তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন (যেমন পূর্ববর্তী উম্মতদের কাছ থেকে এমনি ধরনের প্রতিশোধ নিয়েছেন। কারও উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে, কাউকে ঝড়ঝঞ্ঝা আক্রমণ করেছে এবং কাউকে নিমজ্জিত করা হয়েছে। এরূপ হলে তোমাদেরকে জিহাদ করতে হতো না)। কিন্তু (তোমাদেরকে জিহাদ করার নির্দেশ এই জন্য দিয়েছেন যে) তিনি তোমাদের এককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (মুসলমানদের পরীক্ষা এই যে, কে আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীতে নিজের জীবনকে মূল্যবান মনে করে তা দেখা এবং কাফিরদের পরীক্ষা এই যে, জিহাদ ও হত্যার দৃশ্য দেখে কে হুঁশিয়ার হয়ে কে সত্যকে কবূল করে, তা দেখা। জিহাদে যেমন কাফিরদেরকে হত্যা করা সাফল্য, তেমনি কাফিরদের হাতে নিহত হওয়াও ব্যর্থতা নয়। কেননা) যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্মকে (জিহাদের এই কর্মসহ) কখনও বিনষ্ট করবেন না। (বাহ্যত মনে করা যায় যে, যখন তারা কাফিরদের বিপক্ষে জয়লাভ করতে পারল না এবং নিজেরাই নিহত হল, তখন যেন তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা তাদের কর্মের অপর একটি ফল অর্জিত হয়, যা বাহ্যিক সফলতার চাইতে বহুগুণে উত্তম। তা এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (মনযিলে) মকসূদ পর্যন্ত (যা পরে বর্ণিত হবে) পৌঁছে দেবেন এবং তাদের অবস্থা (কবর, হাশর-পুলসিরাত ও পরকালের সব জায়গায়) ভাল রাখবেন। (কোথাও কোন ক্ষতি ও অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না) এবং (এই মনযিলে মকসূদ পর্যন্ত পৌঁছা এই যে) তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন যা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। (ফলে প্রত্যেক জান্নাতী নিজ নিজ বাসস্থানে কোনরূপ খোঁজাখুঁজি ছাড়াই নির্বিবাদে পৌঁছে যাবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদে বাহ্যিক পরাজয় অর্থাৎ নিজে নিহত হওয়াও বিরাট সাফল্য। অতঃপর জিহাদের পার্থিব উপকারিতা ও ফযীলত বর্ণনা করে তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে ঃ) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে (অর্থাৎ তার দীন প্রচারে) সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন (এর পরিণতি দুনিয়াতেও শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করা—প্রথমেই হোক কিংবা কিছুদিন পর পরিণামে হোক। কোন কোন মু'মিনের নিহত হওয়া কিংবা কোন যুদ্ধে সাময়িক পরাজয় বরণ করা এর পরিপন্থী নয়) এবং (শত্রুর মুকাবিলায়) তোমাদের পা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখবেন—(প্রথমেই হোক কিংবা সাময়িক পরাজয়ের পরে হোক আল্লাহ্ তাদেরকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রেখে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। দুনিয়াতে বারবার এরূপ প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এ হচ্ছে মুসলমানদের অবস্থার বর্ণনা) আর যারা কাফির তাদের জন্য (দুনিয়াতে মু'মিনদের মুকাবিলা করার সময়) দুর্ভোগ (ও পরাজয়) রয়েছে এবং (পরকালে) তাদের কর্মসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষ্ফল করে দেবেন (যেমন সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা কাফিররা উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং) এটা (অর্থাৎ কাফিরদের ক্ষতি ও কর্মসমূহের নিষ্ফল হওয়া) এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা পছন্দ করে না (বিশ্বাসগতভাবেও এবং কর্মগতভাবেও) অতএব, আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহকে (প্রথম থেকেই) বরবাদ করে দিয়েছেন। (কেননা কুফর সর্বোচ্চ বিদ্রোহ। এর পরিণতি তাই। তারা যে আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করে না) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি, অতঃপর দেখেনি যে,

তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন (তাদের জনশূন্য প্রাসাদ ও বাসস্থান দেখেই তা বোঝা যায়। অতএব, তাদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। তারা কুফর থেকে বিরত না হলে) এ কাফিরদের জন্যও অনুরূপ শাস্তি রয়েছে। (অতঃপর উভয় পক্ষের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে)। এটা (অর্থাৎ মুসলমানদের সাফল্য ও কাফিরদের ধ্বংস) এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের অভিভাবক এবং কাফিরদের (এরূপ) কোন অভিভাবক নেই (যে আল্লাহ্র মুকাবিলায় তাদের কার্যোদ্ধার করতে পারে। ফলে তারা উভয় জাহানে অকৃতকার্য থাকে। মুসলমানরা কোন সময় দুনিয়াতে সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও পরিণামে সফল হবে। পরকালের সফল তো সুস্পষ্টই। অতএব, মুসলমান সর্বদা সফলকাম এবং কাফির সর্বদা ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে থাকে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য ঃ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহমত। কেননা জিহাদকে আসমানী আযাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ কুফর, শিরক ও আল্লাহ্-দ্রোহিতার শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আসমান ও যমীনের আযাব দ্বারা দেওয়া হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও এরূপ হতে পারত, কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীনের কল্যাণে এই উম্মতকে এ ধরনের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্থলে জিহাদ সিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আযাবের তুলনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। প্রথম এই যে, ব্যাপক আযাবে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জিহাদে নারী ও শিশুরা তো নিরাপদ থাকেই, পরন্তু পুরুষও তারাই আক্রান্ত হয়, যারা আল্লাহ্র ধর্মের হিফাযতকারীদের মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাদের মধ্যেও সবাই নিহত হয় না; বরং অনেকের ইসলাম ও ঈমানের তওফীক হয়ে যায়। জিহাদের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের অর্থাৎ মুসলমান ও কাফিরের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে আল্লাহ্র নির্দেশে নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় এবং কে অবাধ্যতা ও কুফরে অটল থাকে কিংবা ইসলামের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখে ইসলাম কবুল করে।

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ—সূরার প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, যারা কুফর ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেবেন; অর্থাৎ তারা যেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ করে, শিরক ও কুফরের কারণে সেগুলোর কোন সওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তাঁদের কর্ম বিনষ্ট হয় না; অর্থাৎ তারা কিছু গোনাহ্ করলেও সেই গোনাহ্র কারণে তাদের সৎকর্ম হ্রাস পায় না। বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম তাদের গোনাহ্র কাফফারা হয়ে যায়।

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ এতে শহীদের দু'টি নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। এক. আল্লাহ্ তাকে হিদায়ত করবেন, দুই. তার সমস্ত অবস্থা ভাল করে দেবেন। অবস্থা বলতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই যে, যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সওয়াবের অধিকারী হবে। আখিরাতে এই যে, সে কবরের আযাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার যিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা হকদারদেরকে তার প্রতি রাযী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। (মাযহারী) শহীদ হওয়ার পর হিদায়ত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে 'মনযিলে মকসূদ' অর্থাৎ জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন ; যেমন কোরআনে জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌঁছে একথা বলবেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰنَا لِهٰذَا

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ—এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌঁছানো হবে না ; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নিয়ামত তথা হুর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যেই বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ, জান্নাত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেওয়ার মধ্যে ও সেখানকার বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চাইতেও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা হবে। (মাযহারী) কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জান্নাতে তার স্থান বলে দেবে এবং সেখানকার স্ত্রীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا—এখানে মক্কার কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেমন আযাব এসেছে, তেমনি তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না।

وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ—مولى শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অভিভাবক। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর আরেক অর্থ মালিক

কোরআনের অন্যত্র কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ

এতে আল্লাহ্ তা'আলাকে কাফিরদেরও মাওলা বলা হয়েছে। কারণ, এখানে মাওলা শব্দের অর্থ মালিক। আল্লাহ্ তা'আলা সবারই মালিক। মু'মিন-কাফির কেউ এই মালিকানার বাইরে নয়।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ
الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً
مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ أَفَمَن كَانَ
عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾
مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۖ
وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۚ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ۖ
وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا
فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

(১২) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফির, তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। (১৩) যে জনপদ আপনাকে বহিষ্কার করেছে, তদপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (১৪) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৫) পরহিযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপ ঃ তাতে আছে নিষ্কলুষ পানির নহর, দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায়

তাদের জন্য আছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহিযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। আর যারা কাফির, তারা (দুনিয়াতে) ভোগবিলাসে মত্ত আছে এবং (পরকাল বিস্মৃত হয়ে) চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। চতুষ্পদ জন্তুরা চিন্তা করে না যে, তাদেরকে কেন পানাহার করানো হচ্ছে এবং তাদের যিম্মায় এর বিনিময়ে কি প্রাপ্য আছে? তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। (উপরে কাফিরদের ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। এতে আপনার শত্রুদের ধোঁকা খাওয়া উচিত নয় এবং তাদের উদাসীনতা দেখে আপনারও দুঃখিত হওয়া সমীচীন নয়। ভোগবিলাসই তাদের বিরোধিতার কারণ। এমনকি, তারা আপনাকে অতিষ্ঠ করে মক্কায়ও বসবাস করতে দেয়নি। কেননা) আপনার যে জনপদ আপনাকে বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করেছে, তদপেক্ষা অনেক শক্তিশালী বহু জনপদকে আমি (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করে দিয়েছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (এমতাবস্থায় এরা কি? এদের অহংকার করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলেই এদেরকে নির্মূল করতে পারেন। আপনি এদের ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাস দেখে দুঃখিত হবেন না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট সময়ে এদেরকেও শাস্তি দেবেন)। যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট (ও প্রামাণ্য) পথ অনুসরণ করে, সে কি তাদের সমান হতে পারে, যাদের কাছে তাদের কুকর্ম শোভনীয় মনে হয় এবং যারা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে? (অর্থাৎ উভয় দলের কাজকর্মে যখন তফাৎ আছে, তখন পরিণতিতেও তফাৎ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে সত্যপন্থী সে সওয়াবের এবং যে মিথ্যাপন্থী সে আযাব ও শাস্তির যোগ্য। এই সওয়াব ও শাস্তির বর্ণনা এই যে) পরহিযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়, তার অবস্থা নিম্নরূপ ঃ তাতে আছে নিষ্কলুষ পানির অনেক নহর (এই পানির গন্ধ ও স্বাদে কোন পরিবর্তন হবে না) দুধের অনেক নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের অনেক নহর এবং পরিশোধিত মধুর অনেক নহর। তথায় তাদের জন্য আছে রকমারি ফলমূল এবং (তাতে প্রবেশের পূর্বে) তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (গোনাহের) ক্ষমা। তারা কি তাদের সমান যারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, অতঃপর তা তাদের নাড়ীভুঁড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ কোন কোন সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুধও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তবে কোন কোন উপকারের কারণে পান করা হয়; যেমন তামাক কড়া হওয়া সত্ত্বেও খাওয়া হয় এবং খেতে

খেতে অভ্যাস হয়ে যায়। জান্নাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সবই পরিবর্তন ও বিস্বাদ থেকে মুক্ত। জান্নাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকেও মুক্ত, একথা সূরা সাফ্ফাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ এমনিভাবে দুনিয়ার মধুর মধ্যে মোম ও আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের মধু পরিশোধিত হবে। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, জান্নাতে আক্ষরিক অর্থেই পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চার প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রূপক অর্থ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, জান্নাতের বস্তুসমূহকে দুনিয়ার বস্তুসমূহের অনুরূপ মনে করা যায় না। সেখানকার প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ ভিন্নরূপ হবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَاۗءَهُمْ ۝ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ۝ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَاۗءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَاۗءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ۝

(১৬) তাদের মধ্যে কতক আপনার দিকে কান পাতে, অতঃপর যখন আপনার কাছ থেকে বাইরে যায়, তখন যারা শিক্ষিত, তাদেরকে বলে ঃ এইমাত্র তিনি কি বললেন? এদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৭) যারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সৎপথপ্রাপ্তি আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ্ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন। (১৮) তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, কিয়ামত অকস্মাৎ তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুত কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে নবী (সা)] তাদের মধ্যে কতক (অর্থাৎ মুনাফিক সম্প্রদায় আপনার প্রচার ও শিক্ষাদানের সময় বাহ্যত) আপনার দিকে কান পাতে (কিন্তু আন্তরিকভাবে মোটেও মনোযোগী হয় না)। অতঃপর যখন তারা আপনার কাছ থেকে (উঠে মজলিস ত্যাগ করে)

বাইরে যায়, তখন অন্যান্য শিক্ষিত (সাহাবী)-দেরকে বলে ঃ এইমাত্র (যখন আমরা মজলিসে ছিলাম, তখন) তিনি কি বলেছিলেন? (তাদের একথা বলাও ছিল এক প্রকার বিদ্রূপ বিশেষ। এতে করে একথা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা আপনার কথা-বার্তাকে ভ্রূক্ষেপযোগ্যই মনে করি না। এটাও এক প্রকার কপটতাই ছিল)। এরাই তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন (ফলে তারা হিদায়েত থেকে দূরে সরে পড়েছে)। এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (তাদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে) যারা সৎপথে আছে (অর্থাৎ মুসলমান হয়ে গেছে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (নির্দেশাবলী শ্রবণ করার সময়) আরও বেশী হিদায়েত করেন (ফলে তারা নতুন নির্দেশাবলীতেও বিশ্বাস করে অর্থাৎ তাদের ঈমান আনার বিষয়বস্তু বেড়ে যায় অথবা তাদের ঈমানকে আরও বেশী শক্তিশালী করে দেন। এটাই সৎকর্মের বৈশিষ্ট্য) এবং তাদেরকে তাকওয়ার তওফীক দান করেন। (অতঃপর মুনাফিক-দের উদ্দেশ্যে এ মর্মে শাস্তির খবর বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী শুনেও প্রভা-বান্বিত হয় না। এতে বোঝা যায় যে) তারা এ বিষয়েরই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত অকস্মাৎ তাদের উপর এসে পড়ুক। (একথা শাসানির ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও যে হিদায়ত অর্জন করছে না, তবে কি তারা কিয়ামতে হিদায়ত হাসিল করবে?) অতএব (মনে রেখ, কিয়ামত নিকটবর্তীই। সেমতে) তার কয়েকটি লক্ষণ তো এসেই গেছে। (সেমতে হাদীসদৃষ্টে স্বয়ং শেষ নবীর আগমন এবং নবুওয়তও কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনাটি যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মো'জেযা, তেমনি কিয়ামতের লক্ষণও। এসব লক্ষণ কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ঈমান আনা ও হিদায়ত লাভ করার ব্যাপারে কিয়ামতের অপেক্ষা করা নিরেট মূর্খতা। কেননা, সে সময়টি বোঝার ও আমল করার সময় হবে না। বলা হয়েছে ঃ) যখন কিয়ামত এসে পড়বে, তখন তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে? (অর্থাৎ তখন উপদেশ উপকারী হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أشراط শব্দের অর্থ আলামত, লক্ষণ। খাতামুন্নাবীয়্যিন (সা)-এর আবির্ভাবই কিয়া-মতের প্রাথমিক লক্ষণ। কেননা, খতমে-নবুওয়তও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। এমনিভাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযাকে কোরআনে اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাও কিয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব প্রাথমিক আলামত কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আলামত সহীহ্ হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে শুনেছেন---নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কিয়ামতের আলামত ঃ জ্ঞানচর্চা উঠে যাবে। অজ্ঞানতা বেড়ে যাবে। ব্যভিচারের প্রসার হবে। মদ্যপান বেড়ে যাবে। পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে; এমনকি, পঞ্চাশ

জন নারীর ভরণ-পোষণ একজন পুরুষ করবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, ইলম হ্রাস পাবে এবং মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে।---(বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন যুদ্ধলব্ধ মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধলব্ধ মাল সাব্যস্ত করা হবে (অর্থাৎ হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে) যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে (অর্থাৎ আদায় করতে কুণ্ঠিত হবে) ইল্‌মে-দীন পার্থিব স্বার্থের জন্য অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বন্ধুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হট্টগোল শুরু হবে, পাপাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে, হীনতম ব্যক্তি জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে, গায়িকা নারীদের গানবাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদ্যপান করা হবে এবং উম্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন তোমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অপেক্ষা করো ঃ একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে পুঁতে যাওয়ার, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কিয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলো একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মুতির মালা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে।

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ۝

(১৯) জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন আপনি আল্লাহ্‌র অনুগত ও অবাধ্য উভয় শ্রেণীর অবস্থা ও পরিণতি শুনলেন, তখন) আপনি (উত্তমরূপে) জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। (এতে ধর্মের যাবতীয় মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা এসে গেছে। কেননা, জেনে রাখুন, বলে পুরোপুরি জেনে রাখা বোঝানো হয়েছে। পুরোপুরি জেনে রাখার জন্য আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পুরোপুরি আমলে আনা অপরিহার্য। মোটকথা এই যে, সমস্ত বিধান সর্বক্ষণ পালন করুন। যদি কোন সময় ত্রুটি হয়ে যায় তা আপনার নিষ্পাপতার কারণে গোনাহ্ নয় ; বরং শুধু উত্তমকে বর্জন করার শামিল হবে। কিন্তু আপনার উচ্চমর্যাদার দিক দিয়ে দৃশ্যত ত্রুটি। তাই) আপনি (এই বাহ্যিক) ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সব মু'মিন পুরুষ ও নারীর জন্যও (ক্ষমার দোয়া করতে থাকুন। একথাও স্মর্তব্য যে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থানের (অর্থাৎ সব অবস্থা ও কাজকর্মের) খবর রাখেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানও একথা জানে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি একথা জানবেন না কেন ? এমতাবস্থায় এই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃঢ় ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী আমল করা। কুরতুবী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে কেউ ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ এতে ইলমের পর আমলের নির্দেশ রয়েছে। অন্যত্র আছে سَابِقُوا إِلَى আরও বলা হয়েছে ঃ اِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ এরপর বলা হয়েছে فَخُذُوهُمْ এসব জায়গায় প্রথমে ইলম অতঃপর তদনুযায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রসূলুল্লাহ্ (সা) যদিও পূর্ব থেকে একথা জনতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদনুযায়ী আমল করা। এ কারণেই এরপর وَاسْتَغْفِرْ অর্থাৎ ইস্তিগফারের আদেশ দান করা হয়েছে। পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থল বিশেষে ইজতিহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। শরীয়তের আইনে ইজতিহাদী ভুল গোনাহ্ নয়; বরং এই ভুলেরও সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গম্বর-গণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরি-প্রেক্ষিতে এই ভুলকে ذَنْب তথা গোনাহ্ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়, যেমন সূরা আবাসায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কঠোর সতর্কবাণী এই ইজতিহাদী ভুলেরই একটি দৃষ্টান্ত। সূরা আবাসায় এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে যে, সেই ইজতিহাদী ভুল যদিও গোনাহ্ ছিল না; বরং এরও এক সওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এমনি ধরনের গোনাহ্ বোঝানো যেতে পারে।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা বেশী পরিমাণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ কর এবং ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা

কর। ইবলীস বলে ঃ আমি মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, প্রত্যুত্তরে তারা আমাকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা সৎ কাজ মনে করে সম্পন্ন করে (যেমন সাধারণ বিদ'আতসমূহের অবস্থা তদ্রূপই)। এতেকরে তাদের তওবা করারও তওফীক হয় না।

مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ-এর শাব্দিক অর্থ ওলটপালট হওয়া এবং مثوى শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তফসীরবিদগণ এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। কেননা, প্রত্যেক মানুষের উপর দ্বিবিধ অবস্থা আসে। এক. যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং দুই. যে অবস্থাকে সে স্থায়ী বৃত্তি মনে করে। এমনিভাবে কোন কোন গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোন কোন গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে অস্থায়ীকে متقلب শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ীকে مثوى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষের যাবতীয় অবস্থার খবর রাখেন।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ
مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ
لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ۚ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ
لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ
وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ
أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۖ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا
رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٢﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٣﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم
بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٢٤﴾
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۙ
وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٢٥﴾

(২০) যারা মু'মিন, তারা বলেঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য! (২১) তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। (২২) ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (২৩) এদের প্রতিই আল্লাহ্‌ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (২৪) তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (২৫) নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্য তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। (২৬) এটা এজন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাব, অপছন্দ করেঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন। (২৭) ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে? (২৮) এটা এজন্য যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। (২৯) যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না? (৩০) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ্‌ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব

যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থাসমূহ যাচাই করি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা মু'মিন, তারা (তো সর্বদা উৎসুক থাকে যে, আরও কালাম নাযিল হোক, যাতে ঈমান তাজা হয় এবং নতুন নতুন নির্দেশ আসলে তারও সওয়াব হাসিল করা যায়; আর সাবেক নির্দেশের তাকীদ আসলে আরও দৃঢ়তা অর্জিত হয়। এই ঔৎসুক্যের কারণে) বলে, কোন (নতুন) সূরা নাযিল হয় না কেন? (নাযিল হলে আমাদের আশা পূর্ণ হত)। অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন (বিষয়বস্তুর) সূরা নাযিল হয় এবং (ঘটনাক্রমে) তাতে জিহাদেরও (পরিষ্কার) উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যু ভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত (ভয়ানক দৃষ্টিতে) তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। (এরূপ তাকানোর কারণ ভয় ও কাপুরুষতা। কারণ, এখন ঈমানের দাবী সপ্রমাণের জন্য তাদের জিহাদে যেতে হবে। তারা যে এভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে,) অতএব (আসল কথা এই যে) সত্বরই তাদের দুর্ভোগ আসবে। (দুনিয়াতেও কোন বিপদে গ্রেফতার হবে, নতুবা পরকালে তো অবশ্যই হবে। অবসর সময়ে যদিও তারা আনুগত্য ও খোশামোদের অনেক কথাবার্তা বলে, কিন্তু) তাদের আনুগত্য ও মিষ্টবাক্য (অর্থাৎ মিষ্টবাক্যের স্বরূপ) জানা আছে। (জিহাদের নির্দেশ নাযিল হওয়ার সময় তাদের অবস্থা দেখে এখন সবার কাছেই তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে)। অতঃপর (জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর) যখন জিহাদের প্রস্তুতি হয়েই যায়, তখন (ও) যদি তারা (ঈমানের দাবীতে) আল্লাহ্‌র কাছে সাচ্চা থাকে (অর্থাৎ ঈমানের দাবী অনুযায়ী সাধারণভাবে সব নির্দেশ এবং বিশেষভাবে জিহাদের নির্দেশ পালন করে এবং খাঁটি মনে জিহাদ করে) তবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। (অর্থাৎ প্রথমে মুনাফিক থাকলে শেষেও যদি তওবা করত, তবু তাদের ঈমান গ্রহণীয় হত। অতঃপর জিহাদের তাকীদ এবং যারা জিহাদে যোগদান না করে গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ তোমরা যে জিহাদকে পছন্দ কর না, তাতে তো একটি পার্থিব ক্ষতিও আছে। সেমতে) যদি তোমরা এমনিভাবে সবাই জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ, তবে সম্ভবত তোমরা (অর্থাৎ সব মানুষ) পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (অর্থাৎ জিহাদের বড় উপকারিতা হচ্ছে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যদি জিহাদ ত্যাগ করা হয়, তবে অনর্থকারীদের বিজয় হবে এবং সব মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা থাকবে না। এরূপ ব্যবস্থা না থাকার কারণে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অধিকার হরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। সুতরাং যে জিহাদে পার্থিব উপকারও আছে, তা থেকে পশ্চাতে সরে যাওয়া আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। অতঃপর মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে) এদেরকেই আল্লাহ্‌ তা'আলা রহমত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন (তাই বিধানাবলী পালন করার তওফীক নেই) অতঃপর (রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার ফলস্বরূপ) তাদেরকে (কবুলের নিয়তে বিধানাবলী শ্রবণ করা থেকে) বধির করে দিয়েছেন এবং (সৎপথ দেখার ব্যাপারে তাদের (অন্তর) দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিয়েছেন। (এরপর বলা হয়েছে যে, কোরআনে

জিহাদ ও অন্যান্য বিধিবিধানের অপরিহার্যতা, কোরআনের সত্যতার প্রমাণাদি, বিধানাবলীর পারলৌকিক ও ইহলৌকিক উপকারিতা এবং বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা যে এদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, তবে) তারা কি কোরআন (—এর অলৌকিকতা ও বিষয়বস্তু) সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না ? ফলে তারা জানতে পারে না) না (চিন্তা করে, কিন্তু) তাদের অন্তরে (অদৃশ্য তালা লেগে আছে ? (এতদুভয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই হয়েছে এবং উভয়টিও হতে পারে। বাস্তবে এ স্থলে উভয়টিই হয়েছে। প্রথমত তারা অস্বীকারের কারণে কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করেনি এরপর এর শাস্তিস্বরূপ অন্তরে তালা লেগে গেছে। একে ختم طبع অর্থাৎ মোহর মারাও বলা হয়েছে। এর প্রমাণ এই আয়াত ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ —এই সমষ্টি ফল হচ্ছে

فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ —অতঃপর চিন্তা না করার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ যারা সোজা পথ

(কোরআনের অলৌকিকতার মত যুক্তিগত প্রমাণাদি দ্বারা এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীর মত ইতিহাসগত প্রমাণাদি দ্বারা) ব্যক্ত হওয়ার পর (সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয় (যে, ঈমান আনার ফলে অমুক অমুক বর্তমান অথবা ভবিষ্যত প্রত্যাশিত উপকারিতা ফওত হয়ে যাবে। মোট-কথা, চিন্তা না করার কারণ হচ্ছে হঠকারিতা। কারণ হিদায়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও তারা উল্টো দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই হঠকারিতার পর শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর কর্মকে শোভন করে দেখিয়েছে। এর ফলে তারা চিন্তা করে না এবং চিন্তা না করার কারণে অন্তরে মোহর লেগেছে)। এটা (অর্থাৎ হিদায়ত সামনে এসে যাওয়া সত্ত্বেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও দূরে সরে পড়া) এজন্য যে, তারা তাদেরকে—যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধানাবলীকে (হিংসাবশত) অপছন্দ করে [অর্থাৎ ইহুদী সরদারগণ। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি হিংসা পোষণ করত এবং সত্য জানা সত্ত্বেও অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করত। মোটকথা, মুনাফিকরা ইহুদী সরদারদেরকে] বলে ঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে নেব। (অর্থাৎ তোমরা আমাদেরকে মুহাম্মদের অনুসরণ করতে নিষেধ কর। এর দু'টি অংশ আছে ঃ এক. বাহ্যিক অনুসরণ না করা এবং দুই. আন্তরিক অনুসরণ না করা। প্রথম অংশের ব্যাপারে তো আমরা উপকারিতাবশত তোমাদের কথা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে মেনে নেব। কেননা, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের সাথে ; যেমন বলা হয়েছে ঃ اِنَّا مَعَكُمْ উদ্দেশ্য এই যে, সত্য থেকে মুখ ফিরানোর কারণ জাতিগত বিদ্বেষ এবং অন্ধ অনুকরণ। যদিও এ ধরনের কথাবার্তা মুনাফিকরা গোপনে বলে ; কিন্তু) আল্লাহ্ তাদের গোপন কথাবার্তা (সম্যক) অবগত

আছেন। (ওহীর মাধ্যমে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করে দেন। অতঃপর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হচ্ছে, যা أَوْلَىٰ لَهُمْ এর তফসীর হিসেবে হতে পারে ; অর্থাৎ তারা যে এমন কাণ্ড করছে) তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ হরণ করবে? এটা (অর্থাৎ এই শাস্তি) এ কারণে (হবে) যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি (অর্থাৎ সন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী আমলসমূহ)-কে ঘৃণা করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (সৎ) কর্মসমূহকে (প্রথম থেকেই) ব্যর্থ করে দিয়েছেন। (সুতরাং তারা এই শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে। কারও কোন মকবুল আমল থাকলে তার বরকতে শাস্তি কিছু না কিছু হ্রাস পায়। অতঃপর وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ -এর তফসীর হিসাবে বলা হচ্ছে ঃ)

যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ আছে, (এবং তারা তা গোপন করতে চায়) তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন না? (অর্থাৎ তারা এটা কিরূপে মনে করতে পারে, যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা যে আলিমুল গায়ব, তা প্রমাণিত ও স্বীকৃত?) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম ; ফলে আপনি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতেন)। পূর্ণ পরিচয়ের অর্থ এই যে, তাদের চেহারার আকার-আকৃতি বলে দিতাম। যদিও রহস্যবশত আমি এরূপ বলিনি, কিন্তু) আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে এখনও তাদেরকে চিনতে পারবেন। (কেননা, তাদের কথাবার্তা সত্যের উপর ভিত্তিশীল নয়। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সত্য ও মিথ্যাকে চিনার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন। ফলে সত্য ও মিথ্যার প্রভাব অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিফলিত হত। এক হাদীসে আছে, সত্য প্রশান্তি দান করে এবং মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টি করে। অতঃপর মু'মিন ও মুনাফিক সবাইকে একত্রে সম্বোধন করে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সবার কর্মসমূহের খবর রাখেন। (সুতরাং মুসলমানদেরকে তাদের আন্তরিকতার প্রতিদান এবং মুনাফিকদেরকে তাদের কপটতা ও প্রতারণার শাস্তি দেবেন। অতঃপর জিহাদ ইত্যাদির ন্যায় কঠিন বিধানাবলীর একটি রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে যেমন, উপরে فَهَلْ عَسَيْتُمْ الخ আয়াতে একটি রহস্য বর্ণিত হয়েছিল)। আমি (কঠিন বিধানাবলীর নির্দেশ দিয়ে) অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে আমি (বাহ্যতও) তাদেরকে জেনে ও পৃথক করে) নিই ; যারা জিহাদ করে এবং যারা জিহাদে দৃঢ়পদ থাকে এবং যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিই। (যাতে জিহাদের নির্দেশের মধ্যে অন্য নির্দেশাবলীও এবং মোজাহাদা ও সবরের অবস্থার মধ্যে অন্যান্য অবস্থাও দাখিল হয়ে যায়, সেজন্য এই বাক্য সংযুক্ত করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ—مُحْكَمَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ মজবুত ও অনড়। এই আভিধানিক অর্থে কোরআনের প্রত্যেক সূরাই مُحْكَمَةٌ কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় مُحْكَم শব্দটি مَنْسُوْخ তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূরার সাথে 'মোহ্কামাহ্' সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা মনসূখ ও রহিত না হলেই আমলের সাধ পূর্ণ হতে পারে। কাতাদাহ (র) বলেন ঃ যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জিহাদের বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব 'মোহ্কামাহ্' তথা অরহিত। এখানে আসল উদ্দেশ্য জিহাদের নির্দেশ ও তা বাস্তবায়ন। তাই সূরার সাথে মোহকামাহ্ শব্দ যুক্তি করে জিহাদের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আসছে।--- (কুরতুবী)

أَوْلَىٰ لَهُمْ আসমায়ীর উক্তি অনুযায়ী এর অর্থ قَارَبَهُ مَا يُهْلِكُهُ অর্থাৎ তার ধ্বংসের কারণসমূহ আসন্ন।---(কুরতুবী)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

আভিধানিক দিক দিয়ে تَوَلِّى শব্দের দুই অর্থ সম্ভবপর। এক. মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও দুই. কোন দলের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে। আবূ হাইয়ান (র) বাহ্রে-মুহীতে এই অর্থকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা শরীয়তের বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও ---জিহাদের বিধানও এর অন্ত-র্ভুক্ত, তবে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তোমরা মূর্খতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যাবে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। মূর্খতা যুগের প্রত্যেকটি কাজে এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করা হত। এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হানা দিত এবং হত্যা ও লুটতরাজ করত। সন্তানদেরকে স্বহস্তে জীবন্ত কবরস্থ করত। ইসলাম মূর্খতা যুগের এসব কুপ্রথা মেটানোর জন্য জিহাদের নির্দেশ জারি করেছে। এটা যদিও বাহ্যত রক্তপাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সারমর্ম হচ্ছে পচা, গলিত অঙ্গকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, যাতে অবশিষ্ট দেহ নিরাময় ও সুস্থ থাকে। জিহাদের মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্মানিত ও সুসংহত হয়। রূহুল মা'আনী, কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে تَوَلِّى শব্দের অর্থ 'রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভ করা' নেওয়া হয়েছে। এমতা-বস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে অর্থাৎ দেশ ও জাতির শাসনক্ষমতা লাভ করলে এর পরিণতি এ ছাড়া কিছুই হবে না যে, তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

আত্মীয়তা বজায় রাখার কঠোর তাকীদ ঃ ارحام শব্দটি رحم-এর বহুবচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সূচিত হয়, তাই বাকপদ্ধতিতে رحم শব্দটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে তফসীরে রূহুল মা'আনীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, ارحام ও ذوى الارحام শব্দ কোন্ কোন্ আত্মীয়তাতে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্য খুবই তাকীদ করেছে। বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও অন্য দুজন সাহাবী থেকে এই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ছিন্ন করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, আত্মীয় ও সম্পর্কশীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। উপরোক্ত হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আলোচ্য আয়াতের বরাতও দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কোরআনের এই আয়াতটি দেখে নাও। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব গোনাহের শাস্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোন গোনাহ্ নেই।---(আবূ দাউদ-তিরমিযী) হযরত সওবানের বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আয়ু বৃদ্ধি ও রুযী-রোযগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়দের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করে। সহীহ্ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপর পক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সদ্ব্যবহার করা উচিত। সহীহ্ বুখারীতে আছে ঃ

ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها

অর্থাৎ সে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সদ্ব্যবহার করে; বরং সেই সদ্ব্যবহারকারী, যে অপর পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখে।—(ইবনে কাসীর)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ—অর্থাৎ যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন। অর্থাৎ তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখেন। হযরত ফারুকে আযম (রা) এই আয়াতদৃষ্টেই উম্মুল ওলাদের বিক্রয় অবৈধ সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ যে মালিকানাধীন বাঁদীর গর্ভ থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে বিক্রয় করলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্কের ছিন্ন হবে, যা অভিসম্পাতের কারণ। তাই এরূপ বাঁদী বিক্রয় করা হারাম।---(হাকেম)

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাতের বিধান এবং এজিদকে অভিসম্পাত করার ব্যাপারে আলোচনা ঃ হযরত ইমাম আহমদ (র)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ পিতাকে এজিদের প্রতি অভিসম্পাত করার অনুমতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তির প্রতি কেন অভিসম্পাত করা হবে না, যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে অভিসম্পাত করেছেন ?

তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করে বললেন ঃ এজিদের চাইতে অধিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী আর কে হবে, যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্ক ও আত্মীয়তার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেনি ? কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করা বৈধ নয়, যে পর্যন্ত তার কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করা নিশ্চিতরূপে জানা না যায়। হ্যাঁ, সাধারণ বিশেষণসহ অভিসম্পাত করা জায়েয; যেমন মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত, দুষ্কৃতকারীর প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত ইত্যাদি।—(রূহুল মা'আনী, খণ্ড ২৬, পৃষ্ঠা ৭২)

أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا—অন্তরে তালা লেগে যাওয়ার অর্থ তাই, যা অন্যান্য আয়াতে طبع ও ختم অর্থাৎ মোহর লেগে যাওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্তর এমন কঠোর ও চেতনাহীন হয়ে যাওয়া যে, ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে। এর কারণেই মানুষ সাধারণত বিরামহীনভাবে গোনাহে লিপ্ত থাকে। (নাউযুবিল্লাহ্ মিনহু)

الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ—এতে শয়তানকে দু'টি কাজের কর্তা বলা হয়েছে। এক. تسويل—এর অর্থ সুশোভিত করা; অর্থাৎ মন্দ বিষয় অথবা মন্দ কর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেওয়া। দুই. املاء এর অর্থ অবকাশ দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান প্রথমে তো তাদের মন্দ কর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে ভাল ও শোভন করে দেখিয়েছে, এরপর তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশায় জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

أضغان শব্দটি ضغن-এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত এবং বাহ্যত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত, কিন্তু অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনকে আলিমুল গায়েব জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কেন নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরের গোপন ভেদ ও বিদ্বেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন ? ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বারাআতে তাদের ক্রিয়াকর্মের পরিচয় বলে দিয়েছেন, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সূরা বারাআতকে সূরা ফাযিহা অর্থাৎ অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে।

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ—অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যদ্দ্বারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে

لو অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতাম ঃ কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশত আমার সহনশীলতা গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করা পছন্দ করিনি, যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বোঝাতে হবে এবং অন্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছি যে, আপনি মুনাফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন।---(ইবনে কাসীর)

হযরত ওসমান গনী (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয় অন্তরে গোপন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোন বিষয় গোপন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সত্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি ভাল হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। কোন কোন হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেওয়া হয়েছিল। মসনদে আহমদে ওকবা ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এক খোতবায় ছত্রিশ জন মুনাফিকের নাম বলে বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে।---(ইবনে কাসীর)

حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ—আল্লাহ্ তা'আলা তো সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জ্ঞান রাখেন। এখানে জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ যে বিষয়টি আল্লাহ্র জ্ঞানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনা-ভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া।---(ইবনে কাসীর)

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَاۤقُّوا الرَّسُوْلَ
مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ
اَعْمَالَهُمْ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ
وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ۝ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۝ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْۤا

إِلَى السَّلْمِ ۖ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾
إِنَّمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ
أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ
يُخْرِجْ أَضْغَٰنَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِى سَبِيلِ
اللَّهِ ۚ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۚ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ
وَاللَّهُ الْغَنِىُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ
ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا أَمْثَٰلَكُم ﴿٣٨﴾

(৩২) নিশ্চয় যারা কাফির এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর রসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি ব্যর্থ করে দিলেন তাদের কর্মসমূহকে। (৩৩) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রসূল (সা)-এর আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (৩৪) নিশ্চয় যারা কাফির এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে অতঃপর কাফির অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (৩৫) অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহ্‌ই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। (৩৬) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। (৩৭) তিনি তোমাদের কাছে ধনসম্পদ চাইলে অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। (৩৮) শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় যারা কাফির এবং (অন্য মানুষকেও) আল্লাহ্‌র পথ (অর্থাৎ সত্যধর্ম) থেকে

ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য সৎ (অর্থাৎ ধর্মের) পথ (যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মুশরিক-দের জন্য ও ইতিহাসগত প্রমাণাদির মাধ্যমে কিতাবধারীদের জন্য) ব্যক্ত হওয়ার পর রসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্‌র (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ধর্মের) কোনই ক্ষতি করতে পারবে না (বরং এই ধর্ম সর্বাবস্থায় পূর্ণতা লাভ করবে। সেমতে তাই হয়েছে) এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রচেষ্টাকে (যা সত্য ধর্ম মিটানোর জন্য তারা করছে) নস্যাৎ করে দেবেন। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং [যেহেতু রসূল (সা) আল্লাহ্‌রই বিধান বর্ণনা করেন---বিশেষ করে ওহীর মাধ্যমে বর্ণিত বিধান হোক অথবা ওহী বর্ণিত সামগ্রিক বিধির আওতাভুক্ত বিধান হোক---তাই] রসূল (সা)-এর (ও) আনুগত্য কর এবং (কাফির-দের ন্যায় আল্লাহ্ ও রসূলের বিরোধিতা করে) নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (এর বিবরণ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে আসবে)। নিশ্চয় যারা কাফির এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর কাফির অবস্থায়ই মারা যায়, আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (ক্ষমা না করার জন্য কুফরের সাথে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা শর্ত নয়; বরং শুধু মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকারই এটা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু অধিক ভর্ৎসনার জন্য এই বাস্তব কথাটি সংযুক্ত করা হয়েছে যে, তখনকার কাফির সরদারদের মধ্যে এই দোষটিও বিদ্যমান ছিল। যখন জানা গেল যে, মুসলমানরা আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং কাফিররা অপ্রিয়, তখন হে মুসলমানগণ) তোমরা (কাফিরদের মুকাবিলায়) হীনবল হয়ো না এবং (হীনবল হয়ে তাদেরকে) সন্ধির আহ্‌বান জানিও না, তোমরাই প্রবল হবে (এবং তারা পরাভূত হবে। কেননা, তোমরা প্রিয় ও তারা অপ্রিয়)। আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন (এটা তোমাদের পার্থিব সাফল্য এবং পরকালে এই সাফল্য হবে যে) তিনি তোমাদের কর্মকে (অর্থাৎ কর্মের সওয়াবকে) হ্রাস করবেন না। (এটা হচ্ছে জিহাদের উৎসাহ প্রদান। অতঃপর দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা উল্লেখ করে জিহাদের উৎসাহ এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ভূমিকা প্রদান করা হচ্ছে) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা। (এতে যদি নিজের উপকারের জন্য জান ও মালকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও, তবে এই উপকারই কয়দিনের এবং এর সারমর্মই কি?) যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, (এতে জান ও মালের বিনিময়ে জিহাদও এসে গেছে) তবে আল্লাহ্ নিজের কাছ থেকে তোমাদের উপকার করবেন এভাবে যে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং (তোমাদের কাছে কোন উপকার প্রত্যাশা করবেন না। সেমতে) তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ (ও যা প্রাণের তুলনায় সহজ নিজের উপকারের জন্য) চাইবেন না, (যা দেওয়া সহজ তাই যখন চাইবেন না, তখন যা দেওয়া কঠিন তা কিরূপে চাইবেন? বলা বাহুল্য, আমাদের জান ও মাল খরচ করলে আল্লাহ্ তা'আলার কোন উপকার হয় না এবং তা সম্ভবও নয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَهُوَ يُطْعِمُ

وَلَا يُطْعِمُ সেমতে) যদি (পরীক্ষাস্বরূপ) তিনি তোমাদের কাছে ধনসম্পদ চান, অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করেন (অর্থাৎ সমুদয় ধনসম্পদ চান), তবে তোমরা (অর্থাৎ তোমা-দের অধিকাংশ লোক) কার্পণ্য করবে (অর্থাৎ দিতে চাইবে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা

তোমাদের অনীহা প্রকাশ করে দেবেন। তাই এই সম্ভবপর বিষয়টিকেও বাস্তবায়িত করা হয়নি)। হ্যাঁ, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে (যার উপকার নিশ্চিতরূপে তোমরাই পাবে— স্বল্প পরিমাণ ধনসম্পদ) ব্যয় করার আহবান জানানো হয় (অবশিষ্ট বিপুল ধনসম্পদ তোমাদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হয়) অতঃপর (এর জন্যও) তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করে, তারা (প্রকৃতপক্ষে নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করে। অর্থাৎ নিজেদেরকেই এর চিরস্থায়ী উপকার থেকে বঞ্চিত রাখে) আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন (যে তাঁর ক্ষতির আশংকা থাকতে পারে) এবং তোমরা সবাই (তাঁর) মুখাপেক্ষী। (তোমাদের এই মুখাপেক্ষিতার কারণেই তোমাদেরকে ব্যয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, পরকালে তোমাদের সওয়াব দরকার হবে। এসব কর্মই সওয়াব লাভের উপায়)। যদি তোমরা (আমার বিধানাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত (অবাধ্য) হবে না (বরং অত্যন্ত অনুগত হবে। এই কাজ তাদের দ্বারা করানো হবে এবং এভাবে সেই রহস্যপূর্ণতা লাভ করবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ — আলোচ্য আয়াতও মুনাফিক এবং ইহুদী বনী কোরায়যা ও বনী নুসায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াত সেসব মুনাফিকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কোরাইশ-কাফিরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বারজন লোক সমগ্র কোরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফির বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ — এখানে 'কর্ম বিনষ্ট' করার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না; বরং ব্যর্থ করে দেবেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই লিখিত হয়েছে। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুফর ও নিফাকের কারণে তাদের সৎকর্মসমূহ যেমন সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্ফল হয়ে যাবে — গ্রহণযোগ্য হবে না।

لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ — কোরআন পাক এ স্থলে حبط এর পরিবর্তে ابطال উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে حبط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসল কাফিরের কোন আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল; কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসব কর্মকেও নিষ্ফল করে দেয়।

আমল বাতিল করার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোন কোন সৎ কর্মের জন্য অন্য সৎ কর্ম করা শর্ত। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করে না, সে তার সৎ কর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণত প্রত্যেক সৎকর্ম কবূল হওয়ার শর্ত এই যে, তা খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে, তাতে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব এবং নাম-যশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না! কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ অতএব যে সৎকর্ম রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহ্‌র কাছে বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে সদকা-খয়রাত সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ —অর্থাৎ অনুগ্রহের বড়াই করে অথবা গরীবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা-খয়রাতকে বাতিল করো না। এতে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহের বড়াই করলে অথবা গরীবকে কষ্ট দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ তাই হতে পারে, যা তিনি এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সৎ কর্মসমূহকে গোনাহের মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন ইবনে জুরায়েজ বলেন ঃ بالرياء والسمعة মুকাতিল প্রমুখ বলেন ঃ بالمن —কেননা আহলে সুন্নত দলের ঐকমত্যে কুফর ও শিরক ছাড়া কোন কবীরা গোনাহ্‌ও এমন নেই; যা মু'মিনদের সৎ কর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণত কেউ চুরি করল এবং সে নিয়মিত নামাযী ও রোযাদার। এমতাবস্থায় তাকে বলা হবে না যে, তোমার নামায রোযা বাতিল হয়ে গেছে—এগুলোর কাযা কর। অতএব, সেসব গোনাহ্‌ দ্বারাই সৎ কর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সৎ কর্ম কবূল হওয়ার জন্য শর্ত, যেমন রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা। এরূপ উদ্দেশ্যে না করা প্রত্যেক সৎ কর্ম কবূল হওয়ার জন্য শর্ত। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ সৎ কর্মের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে এবং স্বয়ং সৎ কর্ম বিনষ্ট হওয়া হবে না। এমতাবস্থায় এটা সকল গোনাহ্‌র ক্ষেত্রেই শর্ত হবে। যার আমলে গোনাহ্‌র প্রাধান্য থাকবে, তার অল্প সৎ কর্মেও আযাব থেকে রক্ষা করার মত বরকত থাকবে না; বরং সে নিয়মানুযায়ী গোনাহ্‌র শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু পরিমাণে ঈমানের বরকতে শাস্তি ভোগার পর মুক্তি পাবে।

আমল বাতিল করার তৃতীয় প্রকার এই যে, কোন সৎ কর্ম শুরু করার পর ইচ্ছাকৃত-ভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। উদাহরণত নফল নামায অথবা রোযা শুরু করে বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। এটাও আলোচ্য আয়াতের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত এবং নাজায়েয। ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মযহাব তাই। তিনি বলেন ঃ যে সৎ কর্ম প্রথমে ফরয অথবা ওয়াজিব ছিল না; কিন্তু কেউ তা শুরু করে দিলে সেই সৎকর্ম পূর্ণ করা আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে ফরয হয়ে যাবে। কেউ এরূপ আমল শুরু করে বিনা ওযরে ছেড়ে দিলে অথবা

ইচ্ছাকৃতভাবে ফাসেদ করে দিলে সে গোনাহ্‌গার হবে এবং কাযা করাও ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র)-র মতে গোনাহ্‌গারও হবে না এবং কাযাও করতে হবে না। কারণ, প্রথমে যখন এই আমল ফরয অথবা ওয়াজিব ছিল না, তখন পরেও ফরয ও ওয়াজিব হবে না। কিন্তু হানাফীদের মতে আয়াতের ভাষা ব্যাপক। এতে ফরয, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি সব আমল বিদ্যমান। তফসীরে মাযহারীতে এ স্থানে অনেক হাদীস বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ

এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরুল্লেখের এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফিরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে এবং এই আয়াতে পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উদ্ধৃত করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফিরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও শামিল ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা কাফির অবস্থায় যেমন সৎকর্ম করেছিল, তা সবই নিষ্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর সওয়াব পাবে না। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফিরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ—এ আয়াতে কাফিরদেরকে সন্ধির আহবান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا—অর্থাৎ কাফিররা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়। এ থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব হলে তোমরা সন্ধি করতে পার। পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েয, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের শুরুতে فَلَا تَهِنُوا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জিহাদ থেকে পলায়নের মনোভাব নিয়ে যে সন্ধি করা হয়, তাই নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও কোন বিরোধ নেই। কারণ, وَإِنْ

جَنَحُوا আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সন্ধি করা না হয়, বরং মুসলমানদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়।

وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান হ্রাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান পরকালে পাবে। অতএব কষ্ট করলেও মু'মিন অকৃতকার্য নয়।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا—সংসারআসক্তিই মানুষের জন্য জিহাদে বাধাদানকারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি আসক্তি, পরিবার-পরিজনের আসক্তি এবং টাকা-কড়ির আসক্তি সবই দাখিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহব্বতকে পরকালের স্থায়ী অক্ষয় নিয়ামতের মহব্বতের উপর প্রাধান্য দিও না।

وَلَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ—আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কোরআনেই যাকাত ও সদকার বিধান এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার তাকীদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন ঃ لَا يَسْئَلْكُمْ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোন উপকারের জন্য চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য চান। এই আয়াতেও يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ শব্দ দ্বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার জন্য বলার কারণ এই যে, পরকালে তোমরা সওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং সেখানে তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বক্তব্যই পেশ করা হয়েছে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত ঃ مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্য কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর

প্রয়োজনও নেই। কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, لَا يَسْئَلْكُم বলে সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা ইবনে উয়ায়নার উক্তি।—(কুরতুবী) পরবর্তী আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ إِنْ يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ—يُحْفِ শব্দটি إِحْفَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাড়াবাড়ি করা এবং কোন কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। এই আয়াতের মর্ম সবার মতে এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং এই আদেশ পালন তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হত। এমনকি, আদায় করার সময় মনের এই অপ্রিয় ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ত। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে لَا يَسْئَلْكُم বলে তাই বোঝানো হয়েছে, যা দ্বিতীয় আয়াতে فَيُحْفِكُمْ সংযুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি যাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক ফরয কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমত সেগুলো স্বয়ং তোমাদেরই উপকারার্থে করেছেন—আল্লাহ্ তা'আলার কোন উপকার নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলা এসব ফরয কাজের ক্ষেত্রে করুণাবশত অল্প পরিমাণ অংশই ফরয করেছেন। ফলে একে বোঝা মনে করা উচিত নয়। যাকাতে মজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক অথবা ২০ ভাগের এক, ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মাত্র। অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চান নি। সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তা স্বভাবতই অপ্রিয় ও বোঝা মনে হতে পারত। তাই এই অল্প পরিমাণ অংশ সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ—أَضْغَانٌ শব্দটি ضِغْنٌ এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন বিদ্বেষ ও গোপন অপ্রিয়তা। এ স্থলেও গোপন অপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করে দেওয়া মানুষের কাছে স্বভাবতই অপ্রিয় ঠেকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধনসম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয় ভাব তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করেছ। শেষ আয়াতে একথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ—অর্থাৎ তোমাদেরকে

তোমাদের ধনসম্পদের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেওয়া হলে তোমাদের কেউ কেউ এতে কৃপণতা করে। এরপর বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ —অর্থাৎ যে ব্যক্তি এতেও কৃপণতা করে, সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করে না; বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই ক্ষতি করে। কারণ, এতে করে সে পরকালের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফরয তরক করার শাস্তির যোগ্য হয়। অতঃপর এই কথাটিই আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ —অর্থাৎ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা মানে স্বয়ং তোমাদের অভাব দূর করা। وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের অভাবমুক্ততাকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তোমাদের ধনসম্পদে আল্লাহ্ তা'আলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেরও মুখাপেক্ষী নন। যদি তোমরা সবাই আমার বিধানাবলী পরিত্যাগ করে বস, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকী রাখতে চাইব, ততদিন সত্য ধর্মের হিফাযত এবং বিধানাবলী পালন করার জন্য অন্য জাতি সৃষ্টি করব। তারা তোমাদের মত বিধানাবলীর প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ 'অন্য জাতি বলে অনারব জাতি বোঝানো হয়েছে।' হযরত ইকরামা বলেন ঃ এখানে পারসিক ও রোমক জাতি বোঝানো হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামের সামনে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তখন তাঁরা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! (সা) তাঁরা কোন্ জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর তাঁরা আমাদের মত শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি বিমুখ হবে না? রসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিসে উপস্থিত হযরত সালমান ফারসী (রা)-র উরুতে হাত মেরে বললেন ঃ সে এবং তাঁর জাতি। যদি সত্য ধর্ম সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত, (যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না) তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্য ধর্ম হাসিল করত এবং তা মেনে চলত।---(তিরমিযী, হাকেম, মাযহারী)

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইমাম আবূ হানীফা (র)-র প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবূ হানীফা (র) ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন।---(তফসীরে-মাযহারীর প্রান্ত-টীকা)

سورة الفتح

সূরা ফাত্হ

মদীনায় অবতীর্ণ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ① لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ

وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ②

وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا ③

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে।

(১) নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট (২) যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি (হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে) আপনাকে একটি প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির এই ফায়দা হয়েছে যে, এটা একটা আকাঙ্ক্ষিত বিজয় তথা মক্কা বিজয়ের কারণ হয়ে গেছে। এদিক দিয়ে সন্ধিটিই বিজয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। মক্কা বিজয়কে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলার কারণ এই যে, ইসলামী শরীয়তে বিজয়ের উদ্দেশ্য রাজ্য করতলগত হওয়া নয়; বরং ইসলামকে প্রবল করা উদ্দেশ্য। মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য বহুলাংশে হাসিল হয়ে যায়। কেননা, আরবের গোত্রসমূহ এই অপেক্ষায় ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর স্বগোত্রের মুকাবিলায় বিজয়ী হলে আমরাও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেব। মক্কা বিজিত হলে পর চতুর্দিক থেকে আরবের গোত্রসমূহ আগমন করতে থাকে এবং নিজে অথবা প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। (বুখারী) মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ের লক্ষণাদি ফুটে উঠে, তাই একে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল এই বিজয়ের কারণ ও উপায়। কারণ, মক্কাবাসী-দের সাথে প্রায়ই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণে মুসলমানরা নিজেদের শক্তি ও সমরোপকরণ বৃদ্ধি করার অবকাশ পেত না। হুদায়বিয়ার সন্ধি হওয়ার ফলে মুসলমানরা নির্বিঘ্নে তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের

সংখ্যা বেড়ে যায়। খায়বর বিজয়ের ফলে সমরোপকরণের দিক দিয়ে তারা অপরের উপর চাপ সৃষ্টি করার মত শক্তিশালী হয়ে যায়। এরপর কোরাইশদের পক্ষ থেকে যখন চুক্তি ভঙ্গ করা হল, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) দশ হাজার সাহাবী সমভিব্যাহারে মুকাবিলার জন্য রওনা হলেন। মক্কাবাসীরা এতই ভীত হয়ে পড়ল যে, বেশি যুদ্ধও করতে হল না এবং তারা আনুগত্য স্বীকার করে নিল। যুদ্ধ যা হল, তা এতই সামান্য ও সীমাবদ্ধ ছিল যে, মক্কা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না সন্ধির মাধ্যমে —এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। মোটকথা, এভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধি বিজয়ের কারণ হয়ে গেছে। তাই রূপক অর্থে এই সন্ধিকেই বিজয় বলে দেওয়া হয়েছে, যাতে মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও আছে। অতঃপর এই বিজয়ের ধর্মীয় ও ইহলৌকিক ফলাফল ও বরকত বর্ণিত হচ্ছে যে, এই বিজয় এ কারণে হয়েছে) যাতে দীন প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে (আপনার প্রচেষ্টার ফলে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে, এর ফলে আপনার সওয়াব অনেক বেড়ে যায় এবং অধিক সওয়াব ও নৈকট্যের বরকতে) আল্লাহ্ আপনার সব অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নিয়ামতসমূহ (যেমন নবুওয়ত দান, কোরআন দান, জ্ঞান দান ও কর্মের সওয়াব দান) পূর্ণ করেন, (এভাবে যে, আপনার সওয়াব ও নৈকট্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এই দুইটি নিয়ামত পরকাল সম্পর্কিত। আরও দুইটি নিয়ামত ইহলৌকিক আছে। তা এই যে) আপনাকে (নির্বিঘ্নে ধর্মের) সরল পথে পরিচালিত করেন (আপনি সরল পথে চলেন —এটা যদিও পূর্ব থেকে নিশ্চিত ; কিন্তু এতে কাফিরদের পক্ষ থেকে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হত। এখন এই বাধা থাকবে না)। এবং (অপর ইহলৌকিক নিয়ামত এই যে) আল্লাহ্ আপনাকে এমন বিজয় দান করেন, যাতে শক্তিই শক্তি থাকে। [অর্থাৎ যার পর আপনাকে কারো সামনে মাথা নত করতে না হয়। সেমতে তাই হয়েছে। সমস্ত আরব উপদ্বীপ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর করতলগত হয়ে যায়]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে সূরা ফাত্হ ষষ্ঠ হিজরীতে অবতীর্ণ হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে-কিরামকে সাথে নিয়ে মক্কা মোকাররমা তশরীফ নিয়ে যান এবং হেরেমের সন্নিকটে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। মক্কার কাফিররা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এই ওমরার কাযা করবেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেকেই বিশেষত, হযরত ফারূকে আযম (রা), এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র ইঙ্গিতে এই সন্ধিকে পরিণামে মুসলমানদের জন্য সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। সন্ধির বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ওমরার ইহ্রাম খুলে হুদায়বিয়া থেকে ফেরত রওনা হলেন, তখন পথিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তব রূপ লাভ করবে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন ঃ তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক ; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। হযরত জাবের বলেন ঃ আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। হযরত বারা ইবনে আযেব বলেন ঃ তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয় ; কিন্তু আমরা হুদায়-বিয়ার ঘটনায় 'বয়াতে-রিযওয়ান'কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বৃক্ষের নীচে উপস্থিত চৌদ্দশ সাহাবীর কাছ থেকে জিহাদের শপথ নিয়েছিলেন। এ সূরায় বয়াতের আলোচনাও করা হয়েছে।---(ইবনে-কাসীর)

যখন জানা গেল যে, আলোচ্য সূরাটি হুদায়বিয়ার ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এই ঘটনার অনেক অংশ এই সূরায় উল্লিখিতও হয়েছে, তখন প্রথমে সম্পূর্ণ ঘটনাটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়। তফসীরে ইবনে কাসীরে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে আরও বেশী বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং চৌদ্দ পৃষ্ঠায় এই কাহিনী আদ্যোপান্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কাহিনীতে অনেক মো'জেযা, উপদেশ, শিক্ষণীয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয় বিধৃত হয়েছে। এখানে কাহিনীর কেবল সেসব অংশ লিখিত হচ্ছে, যেগুলো সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা যে-গুলোর সাথে সূরার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে এই কাহিনী সম্পর্কিত আয়াতসমূহের তফসীর বোঝা খুবই সহজ হয়ে যাবে।

হুদায়বিয়ার ঘটনা ঃ হুদায়বিয়া মক্কার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে 'শমীসা' বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে।

প্রথম অংশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন ঃ আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জবীর, বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় স্বপ্ন দেখলেন, তিনি সাহাবায়ে-কিরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করছেন এবং ইহ্রামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহ্র চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটা অংশ। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তব রূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটি মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শোনালেন, তখন তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে-কিরামের প্রস্তুতি দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা স্বপ্নে কোন বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহূর্তেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল।---(বয়ানুল কোরআন)

দ্বিতীয় অংশ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাহাবায়ে-কিরাম ও মরুবাসী মুসলমানদের সাথে চলার জন্য ডাকা এবং কারো কারো অস্বীকার করা ঃ ইবনে সা'দ প্রমুখ বর্ণনা করেন, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে-কিরাম ওমরা পালনের ইচ্ছা করলেন, তখন আশংকা দেখা দিল যে, মক্কার কোরাইশরা সম্ভবত বাধা দিতে পারে এবং প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তাই তিনি মদীনার নিকটবর্তী গ্রামবাসীদেরকে সাথে চলার জন্য দাওয়াত দিলেন। অনেক

গ্রামবাসী সাথে চলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং বলল ঃ মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সহচরগণ আমাদেরকে শক্তিশালী কোরাইশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করতে চায়। তাদের পরিণাম এটাই হবে যে, তারা এই সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না।—(মাযহারী)

তৃতীয় অংশ মক্কাভিমুখে যাত্রা ঃ ইমাম আহমদ, বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসল করে নতুন পোশাক পরিধান করলেন এবং স্বীয় উষ্ট্রী কাসওয়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমাকে সঙ্গে নিলেন এবং তাঁর সাথে মুহাজির, আনসার ও গ্রামবাসী মুসলমানদের একটি বিরাট দল রওয়ানা হল। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে তাদের সংখ্যা চৌদ্দশ বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্নের কারণে এই মুহূর্তেই মক্কা বিজিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের কারো মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। অথচ তরবারি ব্যতীত তাদের কাছে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। তিনি সাহাবায়ে-কিরামসহ যিলকদ মাসের শুরুতে সোমবার দিন রওয়ানা হন এবং যুলহুলায়ফায় পৌঁছে ইহ্‌রাম বাঁধেন।—(মাযহারী)

চতুর্থ অংশ মক্কাবাসীদের মুকাবিলার প্রস্তুতি ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বড় দল নিয়ে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেছেন--এই খবর যখন মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হল এবং বলল ঃ মুহাম্মদ (সা) সহচরগণসহ ওমরার জন্য আগমন করছেন। যদি আমরা তাকে নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করতে দিই, তবে সমগ্র আরবে এ কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, সে আমাদেরকে পরাজিত করে মক্কায় পৌঁছে গেছে। অথচ আমাদের ও তার মধ্যে একাধিক যুদ্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর তারা শপথ করে বলল ঃ আমরা কখনো এরূপ হতে দেব না। সেমতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বাধা দেওয়ার জন্য খালিদ ইবনে ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি দল মক্কার বাইরে 'কুরাউল-গামীম' নামক স্থানে প্রেরণ করা হল। তারা আশেপাশের গ্রামবাসীদেরকেও দলে ভিড়িয়ে নিল এবং তায়েফের বনী সকীফ গোত্রও তাদের সহযোগী হয়ে গেল। তারা বালদাহ্ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। অতঃপর তারা সবাই পরস্পরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেওয়ার এবং তাঁর মুকাবিলায় যুদ্ধ করার শপথ করল।

সংবাদ পৌঁছানোর একটি অভাবনীয় সরল পদ্ধতি ঃ তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে, বালদাহ্ থেকে নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পৌঁছার স্থান পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাহাড়ের শৃঙ্গে কিছু লোক মোতায়েন করে দেয়—যাতে মুসলমানদের সম্পূর্ণ গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাদের নিকটবর্তী পাহাড়ওয়ালা উচ্চস্বরে দ্বিতীয় পাহাড়ওয়ালা পর্যন্ত, সে তৃতীয় পর্যন্ত এবং সে চতুর্থ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গতিবিধি সম্পর্কে বালদাহে অবস্থানকারীরা অবহিত হয়ে যেত।

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সংবাদ প্রেরক ঃ মক্কাবাসীদের অবস্থা গোপনে পর্যবেক্ষণ করে সংবাদ প্রেরণের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) বিশর ইবনে সুফিয়ানকে আগেই মক্কা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে মক্কাবাসীদের উপরোক্ত সামরিক প্রস্তুতি ও পূর্ণ শক্তিতে বাধা দানের সংকল্পের কথা অবহিত করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কোরাইশদের জন্য আক্ষেপ, কয়েকটি যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও তাদের রণোন্মাদনা এতটুকু দমেনি।

আমাকে ও আরবের অন্যান্য গোত্রকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরা সরে বসে থাকলেই পারত। যদি আরব গোত্রসমূহ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যেত তবে তাদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই হাসিল হয়ে যেত। পক্ষান্তরে যদি আমি বিজয়ী হতাম, তবে হয় তারাও মুসলমান হয়ে যেত, না হয় যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকলেও তখন সবল ও সতেজ অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারত। জানি না, কোরাইশরা কি মনে করছে। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আমাকে যে নির্দেশসহ প্রেরণ করেছেন, তার জন্য আমি একাকী হলেও চিরকাল ওদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকব।

পঞ্চম অংশ ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উষ্ট্রীর পথিমধ্যে বসে যাওয়া ঃ অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) সবাইকে একত্র করে ভাষণ দিলেন এবং পরামর্শ চাইলেন যে, এখন আমাদেরকে এখান থেকেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দেওয়া উচিত, না আমরা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হব এবং কেউ বাধা দিলে তার সাথে যুদ্ধ করব? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও অন্যান্য সাহাবী বললেন ঃ আপনি বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন, কারও সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হন নি। কাজেই আপনি উদ্দেশ্যে অটল থাকুন। হ্যাঁ, যদি কেউ আমাদেরকে মক্কা গমনে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব। এরপর হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বনী ইসরাঈলের মত নই যে, আপনাকে বলে দেব ঃ اَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا (আপনি ও আপনার পালনকর্তা যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখানেই বসলাম)। বরং আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব। রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে বললেন ঃ ব্যস, এখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হও। যখন তিনি মক্কার নিকট পৌঁছলেন এবং খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তিনি সৈন্যদেরকে কিবলামুখী সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) ওব্বাদ ইবনে বিশরকে একদল সৈন্যের আমীর নিযুক্ত করে সম্মুখে প্রেরণ করলেন। তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বাহিনীর বিপরীত দিকে সৈন্য সমাবেশ করলেন। এমতাবস্থায় যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। হযরত বিলাল (রা) আযান দিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) সকলকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও তার সিপাহীরা এই দৃশ্য দেখতে লাগল। পরে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ বলল ঃ আমরা চমৎকার সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছি। তারা যখন নামাযরত ছিল, তখনই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। যাক, অপেক্ষা কর তাদের আরও নামায আসবে। কিন্তু ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আ) 'সালাতুল-খওফ' তথা আপদকালীন নামাযের বিধান নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শত্রুদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়ে নামাযের সময় সৈন্যদেরকে দুইভাগে ভাগ করার পদ্ধতি বলে দিলেন। ফলে তাঁরা শত্রু পক্ষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে যান।

ষষ্ঠ অংশ ঃ হুদায়বিয়ায় একটি মো'জেযা ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদায়বিয়ার নিকটবর্তী হন, তখন তাঁর উষ্ট্রীর সামনের পা পিছলে যায় এবং উষ্ট্রী বসে পড়ে। সাহাবায়ে কিরাম

চেষ্টা করেও উষ্ট্রীকে উঠাতে পারলেন না। তখন সবাই বলতে লাগলেন ঃ কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কাসওয়ার কোন কসুর নেই। তাঁর এরূপ অভ্যাস কখনও ছিল না। তাকে তো সেই আল্লাহ্ বাধা দিচ্ছেন, যিনি 'আসহাবে-ফীল' তথা হস্তী-বাহিনীকে বাধা দিয়েছিলেন। [রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্ভবত তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বপ্নে দেখা ঘটনা বাস্তবায়িত হওয়ার সময় এটা নয়]। তিনি বললেন ঃ যার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আজিকার দিনে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক যে কোন কথা কোরাইশরা আমাকে বলবে, আমি অবশ্যই তা মেনে নেব। এরপর তিনি উষ্ট্রীকে একটি আওয়াজ দিতেই উষ্ট্রী উঠে দাঁড়াল। রসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইবনে ওয়ালীদের দিক থেকে সরে গিয়ে হুদায়বিয়ার অপর প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে পানি খুবই কম ছিল। পানির জায়গা খালিদ ইবনে ওয়ালীদ করায়ত্ত করে নিয়েছিল। মুসলমানদের অংশে একটি মাত্র কূপ ছিল, যাতে অল্প অল্প পানি চুয়ে চুয়ে কূপে পড়ত। সেমতে এই কূপের মধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি মো'জেযা প্রকাশ পেল, তিনি কূপের মধ্যে কুলি করলেন এবং একটি তীর কূপের ভিতরে গেড়ে দিতে বললেন। ফলে কূপের পানি ফুলে ফেঁপে কূপের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অতঃপর পানির কোন অভাব রইল না।

সপ্তম অংশ ঃ প্রতিনিধিদলের মধ্যস্থতায় মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা ঃ অতঃপর প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। প্রথমে বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা সঙ্গীগণসহ আগমন করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে বলল ঃ কোরাইশরা পূর্ণ শক্তি সহকারে মুকাবিলা করার জন্য এসে গেছে এবং পানির জায়গা দখল করে নিয়েছে। তারা কিছুতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। রসূলে করীম (সা) বললেন ঃ আমরা কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। তবে কেউ যদি আমাদেরকে ওমরা পালন করতে বাধা দেয়, তবে আমরা যুদ্ধ করব। অতঃপর তিনি ইতিপূর্বে বিশরকে যা বলেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন ঃ কোরাইশদেরকে কয়েকটি যুদ্ধ দুর্বল করে দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আমাদের সাথে সন্ধি করে নিতে পারে, যাতে তারা নির্বিঘ্নে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায়। এরপর আমাদেরকে অবশিষ্ট আরবদের মুকাবিলায় ছেড়ে দিতে পারে। যদি তারা বিজয়ী হয়, তবে কোরাইশদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই পূর্ণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে তারা হয় মুসলমান হয়ে যাবে, না হয় আমাদের বিরুদ্ধে নব বলে যুদ্ধ করবে। কোরাইশরা যদি এতে সম্মত না হয়, তবে আল্লাহ্র কসম, আমি একাকী হলেও ইসলামের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাব। কোরাইশদেরকে এই পয়গাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বুদায়েল ফিরে গেল। সেখানে পৌঁছার পর কিছু লোক তার কথা শুনতেই চাইল না। তারা যুদ্ধের নেশায় মত্ত হয়ে রইল। অতঃপর গোত্র-সরদার ওরওয়া ইবনে মসউদ বলল ঃ বুদায়েল কি বলতে চায়, তা শুনা দরকার। কথাবার্তা শুনে ওরওয়া কোরাইশ সরদারদেরকে বলল ঃ মুহাম্মদ যা প্রস্তাব দিয়েছে, তা সঠিক। এটা মেনে নাও এবং আমাকে তার সাথে কথা বলার অনুমতি দাও। সেমতে দ্বিতীয়বার ওরওয়া ইবনে মসউদ আলাপ-আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করল ঃ আপনি যদি স্বগোত্র কোরাইশকে নিশ্চিহ্ন করে দেন, তবে এটা কি করে ভাল কথা হবে? দুনিয়াতে আপনি কি কখনো শুনেছেন যে, কোন

ব্যক্তি তার স্বজাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে? অতঃপর সাহাবায়ে কিরামের সাথে তার নরম গরম কথাবার্তা হতে থাকে। ইতিমধ্যেই সে সাহাবায়ে কিরামের এই আত্মোৎসর্গমূলক অবস্থা প্রত্যক্ষ করল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থুথু ফেললে তারা তা হাতে নিয়ে নিজ নিজ মুখ-মণ্ডলে মালিশ করে। তিনি ওযূ করলে সাহাবায়ে কিরাম ওযূর পানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুখমণ্ডলে মালিশ করে। তিনি কথা বললে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়। ওরওয়া ফিরে গিয়ে কোরাইশ সরদারদের কাছে বর্ণনা করল ঃ আমি কায়সার ও কিসরার ন্যায় বড় বড় রাজকীয় দরবারে গমন করেছি এবং নাজ্জাশীর কাছে গিয়েছি কিন্তু আল্লাহ্র কসম, আমি এমন কোন রাজা-বাদশাহ্ দেখিনি, যার জাতি তার প্রতি এতটুকু আত্মোৎসর্গকারী, যতটুকু মুহাম্মদের প্রতি তাঁর সহচরগণ আত্মোৎসর্গকারী। মুহাম্মদের কথা সঠিক। আমার অভিমত এই যে, তোমরা তার প্রস্তাব মেনে নাও। কিন্তু কোরাইশরা বলে দিল ঃ আমরা তার প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না। তাকে এ বছর ফিরে যেতে হবে এবং পরবর্তী বছর এসে ওমরা পালন করতে পারবে। আমরা এছাড়া অন্য কিছু মানি না। যখন ওরওয়ার কথায় কর্ণপাত করা হল না, তখন সে তার দল নিয়ে চলে গেল। এরপর জনৈক গ্রাম্য সরদার জলীম ইবনে আলকামা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করল। সাহাবায়ে কিরামকে ইহ্রাম অবস্থায় কুরবানীর জন্তুসহ দেখে সে-ও ফিরে গিয়ে স্বজাতিকে বোঝাতে চাইল যে, তারা বায়তুল্লাহ্য় ওমরা পালন করতে এসেছে। তাদেরকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। যখন কেউ তার কথা শুনল না, তখন সে-ও তার দল নিয়ে চলে গেল। অতঃপর একজন চতুর্থ ব্যক্তি আলাপ-আলোচনার জন্য আগমন করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকেও সেই কথাই বললেন, যা ইতিপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়াকে বলেছিলেন। সে ফিরে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জওয়াব কোরাইশদেরকে শুনিয়ে দিল।

অষ্টম অংশ ঃ হযরত ওসমান (রা)-কে পয়গামসহ প্রেরণ করা ঃ ইমাম বায়হাকী হযরত ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হুদায়বিয়ায় পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করলেন, তখন কোরাইশরা ঘাবড়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের কাছে নিজের কোন লোক পাঠিয়ে এ কথা বলে দিতে চাইলেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে নয়, ওমরাহ্ পালন করতে এসেছি। অতএব আমাদের বাধা দিও না। এ কাজের জন্য তিনি হযরত ওমর (রা)-কে ডাকলেন। তিনি বললেন ঃ কোরাইশরা আমার ঘোর শত্রু। কারণ, তারা আমার কঠোর-তার বিষয়ে অবগত আছে। এছাড়া আমার গোত্রের এমন কোন লোক মক্কায় নেই, যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তাই আমি আপনার কাছে এমন একজন লোকের নাম প্রস্তাব করছি, যিনি মক্কায় গোত্রগত কারণে বিশেষ শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি হলেন হযরত ওসমান ইবনে আফফান। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওসমান (রা)-কে এ কাজের আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে আরও বলে দিলেন যে, যেসব মুসলমান দুর্বল পুরুষ ও নারী মক্কা থেকে হিজরত করতে সক্ষম হয়নি এবং বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন আছে, তাদের কাছে যেয়ে সান্ত্বনা দেবে যে, তোমরা অস্থির হয়ো না। ইনশাআল্লাহ্ মক্কা বিজিত হয়ে তোমাদের বিপ-দাপদ দূর হওয়ার সময় নিকটবর্তী। হযরত ওসমান (রা) প্রথমে বালদাহে অবস্থানকারী কোরাইশ বাহিনীর কাছে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে সেই পয়গাম শুনিয়ে দিলেন, যা ইতিপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়া ইবনে মসউদকে শুনানো হয়েছিল। তারা বলল ঃ আমরা পয়গাম

শুনলাম। আপনি ফিরে গিয়ে বলে দিন যে, এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাদের জওয়াব শুনে হযরত ওসমান (রা) যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে আবান ইবনে সাঈদের সাথে দেখা হল। আবান তাঁকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হল এবং নিজ আশ্রয়ে নিয়ে বলল ঃ আপনি মক্কায় পয়গাম নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। অতঃপর নিজের অশ্বে হযরত ওসমান (রা)-কে আরোহণ করিয়ে মক্কায় প্রবেশ করল। আবানের গোত্র বনূ সাঈদ মক্কায় অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। হযরত ওসমান (রা) এক একজন সরদারের কাছে পৌঁছলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পয়গাম পৌঁছালেন। কিন্তু সবাই তা প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর হযরত ওসমান (রা) দুর্বল ও অক্ষম মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পয়গাম পৌঁছালেন। তারা খুবই আনন্দিত হল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম বলল। পয়গাম পৌঁছানোর কাজ সমাপ্ত হলে মক্কাবাসীরা হযরত ওসমান (রা)-কে বলল ঃ আপনি ইচ্ছা করলে তওয়াফ করতে পারেন। হযরত ওসমান (রা) বললেন ঃ আমি তওয়াফ করতে পারি না, যে পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা) তওয়াফ না করেন। হযরত ওসমান (রা) মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেন এবং কোরাইশদের রাযী করাবার প্রচেষ্টা চালান।

নবম অংশ ঃ মক্কাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং মক্কাবাসীদের সত্তরজনের গ্রেফতারী ঃ ইতিমধ্যে কোরাইশরা তাদের পঞ্চাশজন লোককে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকটে পৌঁছে সুযোগ বুঝে তাঁকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করল। তারা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল, এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হিফাযত ও দেখাশুনায় নিযুক্ত হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে উপস্থিত করলেন। অপরদিকে হযরত ওসমান (রা) মক্কায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে আরও প্রায় দশজন মুসলমান মক্কা পৌঁছেছিলেন। কোরাইশরা তাদের পঞ্চাশজনের গ্রেফতারীর সংবাদ শুনে হযরত ওসমানসহ সব মুসলমানকে আটক করল। এতদ্ব্যতীত কোরাইশদের একদল সৈন্য মুসলমান সৈন্যবাহিনীর দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের প্রতি তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করল। এতে একজন সাহাবী ইবনে যনীম শহীদ হলেন। মুসলমানরা কোরাইশদের দশজন অশ্বারোহীকে গ্রেফতার করে নিল। অপরপক্ষে হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে বলেও গুজব ছড়িয়ে পড়ল।

দশম অংশ ঃ বায়'আতে-রিযওয়ানের ঘটনা ঃ হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে একটি বৃক্ষের নীচে একত্র করলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাতে বায়'আত করেন। সকলেই তাঁর হাতে বায়'আত করলেন। এই সূরায় এই বায়'আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ্ হাদীসসমূহে এই বায়'আতে অংশগ্রহণকারীদের অসাধারণ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওসমান (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নির্দেশে মক্কা গমন করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের এক হাতের উপর অপর হাত রেখে বললেন ঃ এটা ওসমানের বায়'আত। তিনি নিজের হাতকেই ওসমানের হাত গণ্য করে বায়'আত করলেন। এই বিশেষ ফযীলত হযরত ওসমানেরই বৈশিষ্ট্য।

একাদশ অংশ ঃ হুদায়বিয়ার ঘটনা ঃ অপরদিকে মক্কাবাসীদের মনে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি ভয়ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা স্বয়ং সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী

হয়ে সোহায়েল ইবনে আমর, হোয়ায়তাব ইবনে আব্দুল ওযযা ও মুকরিম ইবনে হিফসকে ওযর পেশ করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট প্রেরণ করল। তাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন পরে মুসলমান হয়েছিল। সোহায়েল ইবনে আমর এসে আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হযরত ওসমান ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা সম্পর্কিত যে সংবাদ আপনার কাছে পৌঁছেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনি আমাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিন। আমরাও তাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। রসূলুল্লাহ্ (সা) কাফির বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। মসনদে আহমদ ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই সূরার هُوَ الَّذِىْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ আয়াতটি এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর সোহায়েল ও তার সঙ্গীরা ফিরে গিয়ে বায়'আতে রিযওয়ানে সাহাবায়ে কিরামের প্রাণচাঞ্চল্য ও আত্মনিবেদনের অভূতপূর্ব অবস্থা কোরাইশদের সামনে বর্ণনা করল। দূতদের মুখে এসব অবস্থা শুনে শীর্ষস্থানীয় কোরাইশ নেতৃবৃন্দ পরস্পরে বলল ঃ এখন মুহাম্মদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে নেওয়াই আমাদের পক্ষে উত্তম যে, তিনি এ বছর ফিরে যাবেন, যাতে সমগ্র আরবে একথা খ্যাত না হয়ে পড়ে যে, আমাদের বাধাদান সত্ত্বেও তারা জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেছে এবং পরবর্তী বছর ওমরা করার জন্য আগমন করবেন ও তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। সেমতে এই সোহায়েল ইবনে আমরই এই পয়গাম নিয়ে পুনরায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দরবারে উপস্থিত হল। তিনি সোহায়েলকে দেখা মাত্রই বললেন ঃ মনে হয় মক্কাবাসীরা সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়েছে। তাই সোহায়েলকে আবার প্রেরণ করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বসে গেলেন এবং ওব্বাদ ইবনে বিশর ও মাসলামা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। সোহায়েল উপস্থিত হয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর সামনে বসে গেল এবং কোরাইশদের পয়গাম পৌঁছে দিল। সাহাবায়ে কিরাম তখন ওমরা না করে ইহ্রাম খুলে ফেলতে সম্মত ছিলেন না। তাঁরা সোহায়েলের সাথে কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বললেন। সোহায়েলের স্বর কখনও উচ্চ এবং কখনও নম্র হল। ওব্বাদ সোহায়েলকে শাসিয়ে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে উচ্চস্বরে কথা বলো না। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরাইশদের শর্ত মেনে সন্ধি করতে সম্মত হলেন। সোহায়েল বলল ঃ আসুন, আমি নিজের ও আপনার মধ্যকার সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করি। রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন ঃ লিখ, বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। সোহায়েল এখান থেকেই বিতর্ক শুরু করে বলল ঃ 'রাহমান' ও 'রাহীম' শব্দ আমাদের বাকপদ্ধতিতে নেই। আপনি এখানে সেই শব্দই লিখেন, যা পূর্বে লিখতেন ; অর্থাৎ 'বিইস্মিকা আল্লাহুমা'। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাও মেনে নিলেন এবং হযরত আলীকে তদ্রূপই লিখতে বললেন। এরপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে বললেন ঃ লিখ এই অঙ্গীকারনামা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পাদন করছেন। সোহায়েল এতেও আপত্তি জানিয়ে বলল ঃ যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ্র রসূল স্বীকারই করতাম, তবে কখনও বায়তুল্লাহ্ থেকে বাধা দান করতাম না। সন্ধিপত্রে কোন এক পক্ষের বিশ্বাসের বিপরীত কোন শব্দ থাকা উচিত নয়। আপনি শুধু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করান। রসূলুল্লাহ্

(সা) তাও মেনে নিয়ে হযরত আলী (রা)-কে বললেন ঃ যা লিখেছ, তা কেটে ফেল এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখ। হযরত আলী আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও আরয করলেন ঃ আমি আপনার নাম কেটে দিতে পারব না। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে ওসায়দ ইবনে হুযায়র ও সাদ ইবনে ওবাদা দৌড়ে এসে হযরত আলী (রা)-র হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন ঃ কাটবেন না এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত আর কিছুই লিখবেন না। যদি তারা না মানে, তবে আমাদের ও তাদের মধ্যে তরবারিই ফয়সালা করবে। চতুর্দিক থেকে আরও কিছু আওয়াজ উচ্চারিত হল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সন্ধিপত্রটি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং নিরক্ষর হওয়া ও লেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে এ কথাগুলো লিখে দিলেন ঃ

هذا ما قضى محمد بن عبد الله و سهيل بن عمرو اهلها على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض -

অর্থাৎ এই চুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ও সোহায়েল ইবনে আমর দশ বছর পর্যন্ত 'যুদ্ধ নয়' সম্পর্কে সম্পাদন করছেন। এই সময়ের মধ্যে সবাই নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমাদের একটি শর্ত এই যে, আপাতত আমাদেরকে তওয়াফ করতে দিতে হবে। সোহায়েল বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, এটা হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (সা) তাও মেনে নিলেন। এরপর সোহায়েল নিজের একটি শর্ত এই মর্মে লিপিবদ্ধ করল যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে আপনার কাছে আগমন করবে, তাকে আপনি ফেরত দেবেন যদিও সে আপনার ধর্মাবলম্বী হয়। এতে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ধ্বনি উত্থিত হল। তারা বলল ঃ সোবহানাল্লাহ্! আমরা আমাদের মুসলমান ভাইকে মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দেব—এটা কিরূপে সম্ভবপর? কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) এই শর্তও মেনে নিলেন এবং বললেন ঃ আমাদের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কাছে যায়, তবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তার জন্য আমরা চিন্তা করব কেন? তাদের কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা যদি তাকে ফিরিয়েও দেই, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সহজ পথ বের করে দেবেন। হযরত বারা (রা) এই সন্ধির সারমর্মে তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেন ঃ এক. তাদের কোন লোক আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে ফিরিয়ে দেব। দুই. আমাদের কোন লোক তাদের কাছে চলে গেলে তারা ফেরত দেবে না। এবং তিন. আমরা আগামী বছর ওমরার জন্য আগমন করব, তিনদিন মক্কায় অবস্থান করব এবং অধিক অস্ত্র নিয়ে আসব না। পরিশেষে লেখা হল এই অঙ্গীকারনামা মক্কাবাসী ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্র মধ্যে একটি সংরক্ষিত দলীল। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অবশিষ্ট আরববাসিগণ স্বাধীন। যার মনে চাইবে মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে এবং যার মনে চাইবে কোরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে। একথা শুনে খোযায়া গোত্র

লাফিয়ে উঠল এবং বলল ঃ আমরা মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি, আর বনূ বকর সামনে অগ্রসর হয়ে বলল ঃ আমরা কোরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি।

সন্ধির শর্তাবলীর কারণে সাহাবায়ে কিরামের অসন্তুষ্টি ও মর্মবেদনা ঃ যখন সন্ধির উপরোক্ত শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়ে গেল, তখন হযরত ওমর (রা) স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি আল্লাহ্র সত্য নবী নন ? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই আমি সত্য নবী। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ আমরা কি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারা কি মিথ্যায় পতিত নয় ? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। হযরত ওমর (রা) আরয করলেন ঃ আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ জান্নাতে এবং তাদের নিহত ব্যক্তিগণ জাহান্নামে নয় কি ? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই। এরপর হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ তবে আমরা কেন ওমরা না করে ফিরে যাবার অপমানকে কবূল করে নেব ? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং রসূল হয়ে কখনও তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করব না। আল্লাহ্ আমাকে বিপথগামী করবেন না। তিনি আমার সাহায্যকারী। হযরত ওমর (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি কি একথা বলেন নি যে, আমরা বায়তুল্লাহ্র কাছে যাব এবং তওয়াফ করব ? তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে একথা বলেছিলাম ; কিন্তু আমি কি একথাও বলেছিলাম যে, এ কাজ এ বছরই হবে ? হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ না, আপনি এরূপ বলেন নি। তিনি বললেন ঃ মনে রেখ, আমি যা বলেছি, তা অবশ্যই হবে। তুমি বায়তুল্লাহ্র কাছে যাবে এবং তওয়াফ করবে।

হযরত ওমর (রা) চুপ হয়ে গেলেন, কিন্তু মনের ক্ষোভ দমিত হচ্ছিল না। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে গেলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন ঃ আরে ভাই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল, তিনি আল্লাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবেন না। আল্লাহ্ তাঁর সাহায্যকারী। কাজেই তুমি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে আঁকড়ে থাক। আল্লাহর কসম, তিনি সত্যের উপর আছেন। মোটকথা, সন্ধির শর্তাবলীর কারণে হযরত ফারূকে-আযমের দুঃখ ও মর্মবেদনার অন্ত ছিল না। তিনি নিজে বলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এই একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া আমার মনে কোন সময় সন্দেহ দেখা দেয়নি। (বুখারী) হযরত আবূ ওবায়দা (রা) তাকে বোঝালেন এবং বললেন ঃ শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। ফারূকে আযম (রা) বললেন ঃ আমি শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ আমি যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, তখন থেকে সর্বদা সদকা-খয়রাত করেছি, রোযা রেখেছি এবং ক্রীতদাস মুক্ত করেছি, যাতে আমার এই ত্রুটি মাফ হয়ে যায়।

আরও একটি দুর্ঘটনা ঃ চুক্তি পালনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অপূর্ব কর্মতৎপরতা ঃ যে সময়ে সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়েছিল এবং সাহাবায়ে কিরামের অসন্তুষ্টি প্রকাশ অব্যাহত ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে কোরাইশ পক্ষের স্বাক্ষরকারী সোহায়েল ইবনে আমরের পুত্র আবূ জন্দল হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে ইতিপূর্বে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং পিতা সোহায়েল তাকে মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, তার উপর অকথ্য নির্যাতনও চালানো হত।

সে কোনরূপে পলায়ন করে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে পৌঁছে গেল এবং তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল। কয়েকজন মুসলমান অগ্রসর হয়ে তাকে নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে নিল। কিন্তু সোহায়েল এই বলে চিৎকার করে উঠল যে, এটাই চুক্তির প্রথম বরখেলাফ কাজ হচ্ছে। আবূ জন্দলকে প্রত্যর্পণ করা না হলে আমি চুক্তির কোন শর্ত মেনে নিতে রাযী নই। রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিসূত্রে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাই আবূ জন্দলকে ডেকে বললেন ঃ আবূ জন্দল, তুমি আরও কিছুদিন সবর কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য এবং অন্যান্য অক্ষম মুসলমানের জন্য শীঘ্রই মুক্তি ও নিষ্কৃতির কোন ব্যবস্থা করে দেবেন। আবূ জন্দলের এই ঘটনা মুসলমানদের আহত অন্তরে আরও বেশি নিমক ছিটিয়ে দিল। তারা তো এই বিশ্বাস নিয়ে এসেছিল যে, মক্কা এই মুহূর্তেই বিজিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানকার অবস্থা দেখে তাদের দুঃখ ও মর্মবেদনার সীমা রইল না। তারা ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু সন্ধি-পত্র চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। সন্ধিপত্রে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আবূ বকর, ওমর, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবদুল্লাহ্ ইবনে সোহায়েল ইবনে ওসর, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, আলী ইবনে আবী তালেব প্রমুখ স্বাক্ষর করলেন এবং কোরাইশদের পক্ষ থেকে সোহায়েল ও তার সঙ্গীরা স্বাক্ষর করল।

ইহ্‌রাম খোলা ও কুরবানী করা ঃ চুক্তি সম্পাদন সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এখন আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। কাজেই সঙ্গে কুরবানীর যেসব জন্তু আছে, সেগুলো কুরবানী করে ফেল এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ইহ্‌রাম খুলে ফেল। উপর্যুপরি দুঃখ ও বেদনার কারণে সাহাবায়ে কিরাম যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই আদেশ সত্ত্বেও তারা স্ব-স্ব স্থান ত্যাগ করলেন না। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) দুঃখিত হলেন এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার কাছে পৌঁছে এই দুঃখ প্রকাশ করলেন। উম্মুল মু'মিনীন তাকে অত্যন্ত সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে বললেন ঃ আপনি সহচরদেরকে কিছু বলবেন না। সন্ধির এক তরফা শর্তাবলী এবং ওমরা ব্যতীত ফিরে যাওয়ার কারণে এই মুহূর্তে তাঁরা ভীষণ মর্মবেদনা অনুভব করছে। আপনি সবার সামনে নাপিত ডেকে মাথা মুণ্ডান এবং নিজের জন্তু কুরবানী করুন। পরামর্শ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা) তাই করলেন। এই দৃশ্য দেখে সাহাবায়ে কিরাম সবাই নিজ নিজ স্থান থেকে উঠলেন এবং একে অপরের মাথা মুণ্ডালেন ও কুরবানী করলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) সবার জন্য দোয়া করলেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ায় উনিশ দিন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কুড়ি দিন অবস্থান করেছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি প্রথমে মাররে যাহ্‌রান অতঃপর আসফানে পৌঁছেন। এখানে পৌঁছার পর সব মুসলমানের পাথেয় প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। আহার্য বস্তু সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি দস্তরখান বিছালেন এবং সবাইকে আদেশ দিলেন--যার কাছে যা আছে এখানে রেখে দাও। ফলে অবশিষ্ট সমস্ত আহার্য বস্তু দস্তরখানে একত্র হয়ে গেল। চৌদ্দশ লোকের সমাবেশ ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) দোয়া করলেন এবং সবাইকে খাওয়া শুরু করার আদেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বর্ণনা করেন চৌদ্দশ লোক এই খাদ্য খুব পেট ভরে আহার করল এবং নিজ নিজ পাত্রে ভরে নিল। এরপরও পূর্বের ন্যায় আহার্য বস্তু অবশিষ্ট ছিল। এই সফরের এটা ছিল দ্বিতীয় মো'জেযা। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই দৃশ্য দেখে খুবই প্রীত হলেন।

সাহাবায়ে কিরামের ঈমান ও আনুগত্যের আরও একটি পরীক্ষা ঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সন্ধির শর্তাবলী ওমরা ব্যতিরেকে ও যুদ্ধে শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ব্যতিরেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে দুঃসহ ছিল। অনন্য সাধারণ ঈমানের বলেই তাঁরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রসূল (সা)-এর আনুগত্যে অটল ও অনড় থাকতে পেরেছিলেন। হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) 'ফুরা গামীম' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন আলোচ্য 'সূরা ফাত্হ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেওয়ায় হযরত ওমর (রা) আবার প্রশ্ন করে বসলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটা কি বিজয়? তিনি বললেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই ভাষ্যের সামনেও সাহাবায়ে কিরাম মাথা নত করে নিলেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় মেনে নিলেন।

হুদায়বিয়া সন্ধির ফলাফল ও কল্যাণের বিকাশ ঃ এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশ পায় যে, কোরাইশ ও তাদের অনেক অনুসারীর সামনে তাদের অন্যায় জেদ ও হঠকারিতা ফুটে ওঠে এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা এবং ওরওয়া ইবনে মসউদ আপন আপন দল নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত সাহাবায়ে কিরামের নজীরবিহীন আত্মনিবেদন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি তাদের অনুপম অনুরাগ, সম্ভ্রম ও আনুগত্য দেখে কোরাইশরা ভীত হয়ে যায় এবং সন্ধি করতে সম্মত হয়। অথচ তাদের জন্য মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এর চাইতে উত্তম সুযোগ আর ছিল না। কেননা, তারা নিজেদের বাড়ী ঘরে ছিল এবং মুসলমানগণ ছিলেন প্রবাসী। পানির জায়গাগুলো তাদের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ ছিলেন ঘাস পানিবিহীন প্রান্তরে। তাদের পূর্ণ রণশক্তি ছিল। মুসলমানদের কাছে তেমন অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তাদের দলের অনেক লোক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে সাক্ষাৎ ও মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে অনেকের অন্তরে ইসলাম ও ঈমান আসন করে নেয় এবং পরে তারা মুসলমান হয়ে যায়। তৃতীয়ত সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের কারণে পথঘাট নিরাপদ হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারিত হয়। আরব গোত্রসমূহের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম আরবের কোণে কোণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। বিভিন্ন রাজা বাদশাহ্র নামে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ্ ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব কার্যক্রমের ফল এই দাঁড়ায় যে, হুদায়বিয়ার ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ব্যাপক দাওয়াত ও ওমরার জন্য বের হওয়ার তাকীদ সত্ত্বেও যেখানে দেড় হাজারের বেশি মুসলমান সঙ্গে ছিল না, সেখানে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়েই সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজিত হয়, যার ফলে বিপুল পরিমাণে সমরোপকরণ হস্তগত হয় এবং মুসলমানদের সমর শক্তি সুসংহত হয়। সন্ধির পর দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুসলমানদের সংখ্যা এত বেড়ে যায়, যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এরই ফলস্বরূপ কোরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের দরুন যখন

রসূলুল্লাহ্ (সা) গোপনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন, তখন সন্ধির মাত্র বিশ-একুশ মাস পরে তাঁর সাথে মক্কা গমনকারী আত্মনিবেদিত মুসলমান সিপাহীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সংবাদ পেয়ে কোরাইশরা উদ্বিগ্ন হয়ে চুক্তি নবায়নের জন্য তড়িঘড়ি আবূ সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করল। রসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তি নবায়ন করলেন না এবং অবশেষে আল্লাহ্র দশ হাজার লশকর সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কোরাইশরা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, মক্কায় তেমন কোন যুদ্ধের প্রয়োজনই হয়নি। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দূরদর্শী রাজনীতিও কিছুটা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিল। তিনি মক্কায় ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এভাবে সব মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এ কারণেই মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না যুদ্ধের মাধ্যমে---এ বিষয়ে ফিক্হশাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোট কথা, অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে কিরাম নিশ্চিন্তে বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করেন, মাথা মুণ্ডান ও চুল কাটেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদেরকে নিয়ে বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন। বায়তুল্লাহ্র চাবি তাঁর হস্তগত হয়। এ সময় তিনি বিশেষভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে সম্বোধন করে বলেন ঃ এই ঘটনাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এরপর বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওমর (রা)-কে বলেন ঃ এই ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ নিঃসন্দেহ কোন বিজয় হুদায়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম ও মহান নয়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তো পূর্ব থেকেই একথা বলতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর মধ্যকার এই মীমাংসিত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা স্বপ্নের দ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের দ্রুততা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না, বরং তাঁর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই 'সূরা ফাত্হে' আল্লাহ্ তা'আলা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বোঝা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ এখানে প্রথমোক্ত لام-কে কারণ বর্ণনার জন্য ধরা হলে এর সারমর্ম এই হবে যে, আয়াতে বর্ণিত তিনটি অবস্থা অর্জিত হওয়ার জন্য আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করা হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই ঃ এক. আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ্ মাফ করা। সূরা মুহাম্মদে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র। তাঁদের বেলায় কোরআনে যেখানে সেখানে ذنب অথবা عصيان (গোনাহ্) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। নবুয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুত্তম কাজ করাও একটি ত্রুটি যাকে কোরআনে শাসানোর ভঙ্গিতে ذنب তথা গোনাহ্ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত

করা হয়েছে। ما تقدم বলে নবুয়তের পূর্ববর্তী ত্রুটি এবং ما تاخر বলে নবুয়ত লাভের পরবর্তী ত্রুটি বোঝানো হয়েছে। —(মাযহারী) প্রকাশ্য বিজয় এই ক্ষমার কারণ এজন্য যে, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলে দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হবে। ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক আকার লাভ করা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জীবনের মহান লক্ষ্যকে সমুন্নত করবে এবং তাঁর সওয়াব ও প্রতিদানকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, সওয়াব ও প্রতিদান বেড়ে যাওয়া ত্রুটি মার্জনার কারণ হয়ে থাকে। —(বয়ানুল- কোরআন)

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا—এটা প্রকাশ্য বিজয়ের দ্বিতীয় কল্যাণ। এখানে প্রশ্ন হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তো পূর্ব থেকেই 'সিরাতে-মুস্তাকীম' তথা সরল পথে ছিলেন এবং শুধু তিনিই নন বরং বিশ্ববাসীকে এই সরল পথের দাওয়াত দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। অতএব, হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে সরল পথ পরিচালনা করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াব সূরা ফাতিহার তফসীরে 'হিদায়ত' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ 'হিদায়ত' একটি ব্যাপক শব্দ। এর অসংখ্য স্তর আছে। কারণ, হিদায়তের অর্থ অভীষ্ট মনযিলের পথ দেখানো অথবা সেখানে পৌঁছানো। প্রত্যেক মানুষের আসল অভীষ্ট মনযিল হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টির অসংখ্য ও অগণিত স্তর আছে। এক স্তর অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অর্জনের আবশ্যকতা বাকী থাকে। কোন বৃহত্তম ওলী এমনকি নবী-রসূলও এই আবশ্যকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এ কারণেই নামাযের প্রত্যেক রাক'আতে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ বলে দোয়া করার শিক্ষা যেমন উম্মতকে দেওয়া হয়েছে, তেমনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকীমের হিদায়ত তথা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহে উন্নতি লাভ করা। এই প্রকাশ্য বিজয়ের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টিরই একটি অত্যুচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করেছেন, যাকে يَهْدِيَكَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا—এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার যে সাহায্য ও সমর্থন আপনি চিরকাল লাভ করে এসেছেন, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলস্বরূপ তার একটি মহান স্তর আপনাকে দান করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ
إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا ۝٤ لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ
اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۝٥ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَ
الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ
دَائِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝٦ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝٧

(৪) তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫) ঈমান এজন্য বেড়ে যায়, যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে তিনি তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহ্‌র কাছে মহা-সাফল্য। (৬) এবং যাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদিনী নারীদেরকে শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। তাদের জন্য মন্দ পরিণাম। আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল অত্যন্ত মন্দ। (৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি মুসলমানদের অন্তরে সহনশীলতা সৃষ্টি করেছেন, (যার প্রতিক্রিয়া দু'টি— এক. জিহাদের বায়'আতের সময় এগিয়ে যাওয়া, সংকল্প ও সাহসিকতা ; যেমন বায়'আতে রিযওয়ানের ঘটনায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দুই. কাফিরদের অন্যায় হঠকারিতার সময় নিজেদের জোশ ও ক্রোধকে বশে রাখা। হুদায়বিয়ার ঘটনার দশম অংশে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তী فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ আয়াতেও বর্ণিত হবে)। যাতে তাদের আগেকার ঈমানের সাথে তাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়। কেননা, আসলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আনুগত্য ঈমানের নূর বৃদ্ধি পাওয়ার একটি উপায়। এই ঘটনায়

প্রত্যেক দিক দিয়ে রসূল (সা)-এর পূর্ণ আনুগত্যের পরীক্ষা হয়েছে। রসূল (সা) যখন জিহাদের ডাক দিলেন এবং বায়'আত নিলেন তখন সবাই হাষ্টচিত্তে এগিয়ে এসে বায়'আত করল এবং জিহাদের জন্য তৈরী হল। এরপর যখন রহস্য ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূল (সা) জিহাদ করতে নিষেধ করলেন, তখন সকল সাহাবী জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ও অস্থির হওয়া সত্ত্বেও রসূল (সা)-এর আনুগত্যে মাথানত করে দিলেন এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ (যেমন ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টি জীব) আল্লাহ্রই। তাই কাফিরদেরকে পরাজিত করা ও ইসলামকে সমুন্নত করার জন্য তোমাদের জিহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা মুখাপেক্ষী নন। তিনি ইচ্ছা করলে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করতে পারেন; যেমন বদর, আহযাব ও হুনায়নের যুদ্ধে তা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এই বাহিনী প্রেরণ করাও মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করার জন্য; নতুবা একজন ফেরেশতাই সবাইকে খতম করার জন্য যথেষ্ট। অতএব কাফিরদের সংখ্যাধিক্য দেখে জিহাদে যেতে তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয় এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর পক্ষ থেকে জিহাদ বর্জন করার আদেশ হলে তাতেও ইতস্তত করা সমীচীন নয়। জিহাদকরণ ও জিহাদ বর্জনের ফলাফল ও পরিণাম আল্লাহ্ তা'আলাই বেশী জানেন। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা (উপযোগিতা সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, [জিহাদকরণ উপযোগী হলে তার নির্দেশ দেন। তাই উভয় অবস্থায় মুসলমানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে রসূল (সা)-এর আদেশের অনুগত রাখা উচিত। এটা ঈমান বৃদ্ধির কারণ। অতঃপর ঈমান বৃদ্ধির ফলাফল বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ] এবং যাতে আল্লাহ্ (এই আনুগত্যের বদৌলতে) মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। এবং যাতে (এই আনুগত্যের বদৌলতে) তাদের পাপ মোচন করেন [কেননা পাপ কর্ম থেকে তওবা এবং সৎ কর্ম সম্পাদন সবই রসূল (সা)-এর আনুগত্যের মধ্যে দাখিল, যা সমস্ত পাপ মোচনকারী] এটা (অর্থাৎ যা উল্লেখ করা হল) আল্লাহ্র কাছে মহা সাফল্য। (এই আয়াতে প্রথম মু'মিনদের অন্তরে শান্তি ও সহনশীলতা নাযিল করার নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এই নিয়ামত রসূল (সা)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়েছে এবং রসূল (সা)-এর আনুগত্য জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ হয়েছে। সুতরাং এসব বিষয় মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করারই ফল। অতঃপর এই প্রশান্তির ফল হিসাবেই মুনাফিকদের এ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং এই বঞ্চিত হওয়ার কারণে আযাবে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এই প্রশান্তি মুসলমানদের অন্তরে নাযিল করেছেন এবং কাফিরদের অন্তরে নাযিল করেন নি] যাতে আল্লাহ্ তা'আলা কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীদেরকে (তাদের কুফরের কারণে) শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ্র প্রতি কুধারণা পোষণ করে। (এখানে পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে তাদের কুধারণা বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে ওমরা করার জন্য মক্কার দিকে যাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তারা অস্বীকার করে পরস্পরে একথা বলেছিল ঃ তারা আমাদেরকে মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধে জড়িত করতে চায়। তাদেরকে যেতে দাও। তারা জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। এ ধরনের উক্তি মুনাফিকদেরই হতে পারে। ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে সমস্ত কুফরী ও শিরকী বিশ্বাস এই কুধারণার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, সব কাফির ও মুশরিকের জন্য এই শাস্তির সংবাদ যে, দুনিয়াতে) তারা বিপর্যয়ে